সমুদ্র ভাবনা

ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সংকলন ও সম্পাদনা :

সাধন দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৬

প্রকাশক : অধীর পাল, অমর ভারতী
৮সি, ট্যামার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রক : পরেশনাথ পান, ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : দিলীপ দাস

নিবেদন

বিগত দশবছর বিভিন্ন উপলক্ষে নানা বিষয়ে কিছু-বলার ও লেখার সুযোগ ঘটেছিল। এগুলোর সাময়িক মূল্য থাকলেও থাকতে পারত; কিন্তু স্থায়ী মূল্য থাকার কথা নয়। তাছাড়া এদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নেই যে একত্র করে অর্থবহ কিছু দাঁড়াবে। কিন্তু ছাত্রপ্রতিম শ্রীসাধন দাশগুপ্ত ভাবলেন অন্যরকম। সব দেখেশুনে গাণিতিক হিসাব পরীক্ষা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন লেখাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে ছাপলে পাঠযোগ্য একটি পুস্তিকা হতে পারে। তাঁর উৎসাহে এই বইয়ের শুরু। তাঁর নিজস্ব বহু বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে, বিজ্ঞান ও ভাষাবিদ তিনি। সে বই পড়ার সৌভাগ্যও আমার। অতএব, তিনি দায়িত্ব নিতে স্বীকার করায় আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। লেখার বিষয় বস্তুর প্রতি তাঁর অফুরন্ত আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত মনে হলো হয়তো ভেবে দেখার মত কিছু আছে! অতএব ইংরেজি-বাংলা রচনাগুলো সংস্কৃত-ধোপ দুরস্ত করার কাজে আমরা লাগলাম। আমি নিশ্চিত হলাম ছাপাখানা থেকে প্রকাশনের ব্যাপারে। এর মত দুরূহ কাজ চিন্তা করা যায় না। আমার কেমন আশঙ্কা সাধনবাবুর উৎসাহ বুঝি পাঠকের (একটিও যদি মেলে) মনে একটুও দাগ কাটবে না। সেই অবহেলা সহ্য করার শক্তিও তাঁর প্রচুর রয়েছে বলেই যা ভরসা! এই প্রচেষ্টা আমার প্রতি তাঁর অকৃপণ মনোভাবের অন্যতম নিদর্শন বটে। সেদিক-থেকে আমার সৌভাগ্য ঈর্ষাযোগ্য।

আর আন্তরিক কৃতজ্ঞ আমার অদৃশ্য প্রকাশক ও মুদ্রণ-কর্মীদের কাছে!

যোধপুর পার্ক
কলিকাতা

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানাচার্য সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

শিক্ষা নিয়ে আলোচনার কালে ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় একেবারেই হঠাৎ একটি স্মৃতির কথা বলেন। স্বাধীনতা-পূর্ব অভঙ্গ বাংলা—যশোর স্টেশনে সেকালীন একজন জনপ্রিয় জননায়ক ট্রেনে ওঠার আগে উপস্থিত জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন। স্টেশনের প্লাটফর্মে মাথায় ছোটবড়, পাতায় ঘন-হালকা দেবদারু গাছগুলিকে দেখিয়ে তিনি বলেন, আমরা চাই সবগাছ সমান হবে ; দরকার হলে ছেঁটে সমান করে দেব।···ট্রেনে একই কম্প্যার্টম্যান্টে এই জননেতা সুশীল-বাবুর সহযাত্রী। এই নম্র বিনয়ী বিজ্ঞানীটি জননেতাকে প্রশ্ন করেন, কাটছাঁট করে সমান না করে, সমান সুবিধার যোগান নিয়ে স্বাভাবিক বাড়ের সুযোগ দেওয়াটিই কি বাঞ্ছনীয় নয়?···বলাবাহুল্য জননেতা কোনো আলোচনা করেন নি !···এই স্মৃতিচারণের শেষে তিনি বলেন, একই পরিবেশে, পরিসরে, একই রীতিতে-পদ্ধতিতে, একজাতীয় বীজে যে গাছ জন্মায়, তার কেউ ছোট, কেউ বড় হয়, উঁচু হয়,—সে অনেক বেশী ডালাপালা মেলতে পারে ; পরিবেশটি শুদ্ধ রাখতে পারে। এ যে কেন হয়, সে প্রশ্নের উত্তর আজকে জানা নেই। তবু যে বাড়তে পারে, তাকে জাপানী রীতিতে ছোটকরে বেঁধে রাখাতে যুক্তি কোথায়? মানুষের ইতিহাসের ধারাটিও যে ভগীরথের মত জায়েন্টরা প্রবাহিত করে রাখেন !

তাঁর কথা শুনে টার্নারের আঁকা একটি নৈসর্গিক দৃশ্যের একটি অংশ চোখে ভেসে ওঠে। একরাশ ছোটবড় গাছপালা—শরতের আবির্ভাবে নানারঙে পাতা সাজিয়ে সেজে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে সোজা খাড়া একটি পপলার গাছ—অনেক উঁচু, শুধু সবুজ পাতায় ভরা। দলছুটনয়, তবু বিশিষ্ট ; রঙে ভরা নয়, তবু মার্জিত। যেন প্রহরী, যেন আলোক বর্তিকা। সেই গাছটির দিকে পাখা মেলে উড়তে চাইছে অস্পষ্ট কয়েকটি পাখি ; আর কয়েকটি সেখানে আশ্রয় নিয়েছে !

৫ফুট ৭ইঞ্চি লম্বা, সুগঠিত দেহের অধিকারী এই আটষট্টি বছরের তরুণটিকে যখন দেখি, তখন টার্নারের আঁকা সেই পপলার গাছটির

কথা মনে হয় দলছুট নয়, তবু ঋজুদৃঢ়, বিশিষ্ট, মহিমান্বিত; বনেদিয়ানায় ঘেরা একজন আপাদমাথা ভদ্রমানুষ; যাঁর দুয়ার জিজ্ঞাসুদের জন্য অবারিত, যাঁর সাহায্যের হাত সকলের জন্য প্রসারিত! অথচ এই মানুষটি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে রাজি হন নি; নিজের ভুল ধরা পড়লে, সকলের আগে নিজেকে সতর্ক করেছেন! বহুবার দেখেছি, অত্যন্ত নম্র বিনীতভঙ্গীতে কোনো বিধিবহির্ভূত কাজে অংশ নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত শান্ত অস্ফুট কণ্ঠস্বর, অথচ কী সুস্পষ্ট বক্তব্য! যিনি অন্যের কাজের সহায়তার জন্য নিজের কাজ বন্ধ করে সেখানে মেতে ওঠেন, তিনিই পারেন তাঁর 'না' টিকে নিরলঙ্কার রূপে জানতে!

কাজে তিনি আনন্দ খুঁজে পান, আবার খোঁজাতেও তাঁর আনন্দ। কাজ কাজ খেলাকে, অনাবশ্যক আড়ম্বরকে, তিনি কিন্তু এড়িয়ে গেছেন। প্রতিবন্ধীবর্গে এরাজ্যের নিস্পৃহ উদাসীনতাকে তিনি মানতে পারেন নি। পারেন নি বলেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। নিজে প্রতিবাদ-মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সময়ে, একবার তিনি যা বলেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো—কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়াটা কঠিন। অনেকে কাজকে মেনে নেয় কর্তব্য বলে। তবে ওদেশে, বিদেশে কাজের একঘেয়েমো কাটানোর জন্য কলকারখানায় ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক বাজে!...বাঙালীরাও কাজটাকে গানে নাচে ভরিয়ে তোলে, তাতে কোন দোষ নেই। তবে গান নাচটাই যদি মুখ্য হয়, আনন্দের হয়, আসল কাজটা যে হারিয়ে যায়! প্রতিবন্ধীদের ক'জনকে নিয়ে গান গাইয়ে, নাচিয়েই আমরা আমাদের কর্তব্যের আনন্দটুকু করলাম!—কী যে দুর্ভাগ্য!

অথচ গান কবিতার তিনি ভক্ত। সেই রসাস্বাদনে তিনি নিভৃতে একা থাকতেই ভালবাসেন। তবে পনেরই আগস্ট নিজের ফ্ল্যাটে জাতীয় পতাকা তুলে খোলা গলায় 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি গাইতে তাঁর অনীহা নেই! বরং সেটি যেন তাঁর সেই দিনের কাজের

অঙ্গ। —গলায় সর্বত্র সুর না লাগতে পারে, সারামুখে কিন্তু একটি কৃতার্থতার আনন্দ জেগে ওঠে !

একটি ঋজু, সূর্যবিমুগ্ধ, সুদূরপ্রসারিত পপলার গাছ যেন !

স্বাধীনতা-পূর্ব অভঙ্গ বাংলার পূবদেশের বরিশালের কুলকাঠি গ্রামে জন্ম। পূববাংলার জোলো আবহাওয়ায় ডাব-সুপুরি-চালতা ঘেরা মেঠোবাড়ি ! একান্নবর্তী পরিবার—আটভাইয়ের সংসার ; যেখানে সব ছোটরা একসঙ্গে বড় হয় ; কেউ আলাদা নয় ; বিশেষ সুযোগের অধিকারী নয় ; বিশিষ্টও নয় ! সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে হই-হই করে বেড়ে ওঠা। বাড়ির কর্তা সুশীলবাবুর পিতা ৺ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় একজন আশ্চর্য মানুষ ! ব্যক্তিত্বপরায়ণ, অথচ স্নেহশীল ; কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার পক্ষপাতী অথচ ছোটদের শেখানোর পদ্ধতিটি তাঁর রপ্ত বলে, সেটিতে তাঁর আনন্দ। যা শিখেছেন, নিজে নিজে শিখেছেন ;—আর সেই শেখার আনন্দ বাড়ির ছেলেমেয়েদের জানিয়ে বিলিয়ে মগ্ন হতে চান। অন্যদিকে ঠিক সময়ে বাড়িতে ফিরে আসা অথবা খাওয়া দাওয়া না করলে রাগারাগি করবেন। অনেক নিষেধের বেড়া চারদিকে ! তবে সেই বেড়ায় ফাঁকফোঁকরও অনেক। সেখানে আছে মায়ের প্রশ্রয়, বাড়ির ‘অন্য মেয়েদের আশ্রয়। গৃহকর্তাকে লুকিয়ে বাড়ির মেয়েদের লুকোচুরি খেলাটা গৃহকর্তা জানেন, আভাসে ইঙ্গিতে মেয়েরা-মায়েরাও জানেন। বাবা আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসেন, মায়েরা দোষী দোষী মুখ করে চক্রান্তের ভঙ্গীতে নিষেধের বেড়াটি ভাঙতে সাহায্য করেন। বলেন, করিসনে বাবা !—সবমিলিয়ে সুখেদুঃখে, রূপকথা নিয়ে ছেলেবেলা গড়ে ওঠে !

"আমার দেশ ছিল পূববাংলায়; বরিশাল জেলার কুলকাঠি গ্রামে। প্রথম দিকে দেশের বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করেছি—গ্রামের ইস্কুলে! ছেলেবেলায় মুখচোরা ছিলাম। তাই হুড়োহুড়ি কিংবা খেলাধূলায় বিশেষ মন ছিল না। ক্লাশের ডানপিটে ছেলেরা অবশ্য সবসময় আমাকে দলে টানতে চাইত। আমি ওদের এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু একবারে রেহাই পাই নি। কুনো স্বভাবের দেখে এক মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে ছেলেদের উসকে দিতেন; বলতেন, 'তোরা জোরজার করে সুশীলকে ধরে খেলতে নিয়ে যা।'··· কোনো ইস্কুলে কলেজে না পড়লেও বাবাই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষক। আমার ইংরেজি শিক্ষার ভিত তিনিই পাকা করে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি প্রায় বাবার সঙ্গে এখানে সেখানে বেড়াতে বেরোতাম। পথে তিনি মুখে মুখে আমাকে ইংরেজি শেখাতেন। এমনি করে খুব অল্প বয়সেই আমি অনেক কঠিন কঠিন বাংলা শব্দের ইংরেজি মানে শিখে ফেলেছিলাম। শুধু লেখাপড়া নয় নৈতিক চরিত্র গঠন, সমাজসেবা ইত্যাদি ব্যাপারেও বাবার কাছ থেকে আমি শিক্ষা লাভ করেছি। বাবা টুকটাক হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন; দিনের পর দিন দেখেছি—ফি নেওয়া তো দূরের কথা, ওষুধ-পত্র পর্যন্ত বিনা মূল্যে যুগিয়ে তিনি দুঃস্থ রোগীদের ভাল করে তুলতেন। তখনকার দিনে বাবা গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার খুলেছিলেন; বাড়িতে ছ-সাতখানা তাঁত বসিয়েছিলেন। আমার কাজ ছিল অবসর সময়ে মাকুতে সুতো তৈরি করা। এইসব তাঁত থেকে যে সব কাপড় তৈরি হতো, তা বিনা লাভে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলি করা হতো!··· আমাদের পড়াশুনোর ধারা ছিল অন্যরকম। শুধু ইস্কুলেই নয়, অনেক মাস্টারমশাই সন্ধ্যের পর বাড়ি বাড়ি টহল দিতেন; দেখতেন—ছাত্ররা কি রকম পড়াশুনো করছে। এতে আমাদের লাভই হতো। বইখাতা খুলে আমরা কানখাড়া করে অপেক্ষা করতাম কখন মাস্টার-মশাই আসেন। যে পড়াটা ঠিকমত বুঝতে পারি নি সেটা ওঁদের কাছ

থেকে বুঝে নিতাম ফের। আমাদের স্কুলে আর একটা অদ্ভুত রীতি ছিল ;—মাস্টারমশাইরা ভাল ছাত্রদের ওপরের ক্লাসে ডেকে নিয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে পড়া ধরতেন। ইংরেজি, সংস্কৃত আর অঙ্কে খানিকটা ভাল ছিলাম বলেই হয়তো মাঝে মাঝে আমারও তলব পড়তো। অবশ্য কিছুটা উঁচু ক্লাশে উঠবার পর আর বড়দের ক্লাসে যেতে চাইতাম না।···মাস্টারমশাইয়ের শাসন ছিল যেমন কড়া, তেমনি তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও ছিল খুব মধুর। আমাদের ক্লাসে একবার একজন বাংলা পড়াতেন। তিনি ছিলেন বেজায় রাগী। এর জন্যে ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছিল অগ্নিশর্মা। একবার তিনি ক্লাসে এসে কি একটা যেন প্রশ্ন করেছিলেন ; কেউ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। ফলে সকলের ভাগ্যে জুটেছিল বেতের বাড়ি। মাস্টারমশাই চলে যেতে ডানপিটের দল আমাকে ছেঁকে ধরলো। ওদের অগাধ বিশ্বাস, আমি ভুল বলতে পারি না। শেষমেশ সত্যি সত্যি দেখা গেল—আমার উত্তরটা ছিল নির্ভুল। তখন ওরা জোট বেঁধে হেডস্যারের কাছে গিয়ে নালিশ করল। মাস্টারমশাই এরপর আমার কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে আমাকে খুব তারিফ করলেন। এই ঘটনার পরেই তিনি ক্লাসসুদ্ধ সব ছেলের মন জয় করে ফেলেছিলেন।

ক্লাস এইটে পড়ার সময় হঠাৎ কাকার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসি—এনুয়াল পরীক্ষার আগেই। পরের বছর রিপন ইস্কুলে ভর্তি হই ক্লাস শুরু হবার প্রায় মাস ছয়েক বাদে। গ্রামের ছেলে ; তার ওপর বেশ কয়েক মাস পড়াশুনো করতে পারি নি। অনেকে ভেবেছিলেন—উঁচু ক্লাসে হয়তো ভাল ফল দেখতে পারব না। সে কথা শুনে আমার রোখ চেপে গিয়েছিল। প্রথম পরীক্ষায় সুবিধা করতে না পারলেও পরের পরীক্ষায় বেশ ভাল নম্বর পেয়ে গ্রামের ছেলে যে শহরের ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে খাটো নয় এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলাম।”

রিপন স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে ঠিক করলেন বিদ্যাসাগর কলেজে কমার্সে ভর্তি হবেন ;—রিপন কলেজ নয়। তার কারণ

হোস্টেলের সুপারিনটেনডেনট সম্পর্কে তাঁর একটি ভীতি। এই শিক্ষক তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও গম্ভীর কঠিন ভাষার প্রয়োগে ছাত্রমহলে শান্তি বজায় রাখতেন। সুশীলবাবুর কাছে এই শাসন সহনীয় মনে হয় নি। মনে হয়েছিল, এখানে অকারণ বাড়াবাড়ি আছে। অতএব আর রিপন নয়,—বিদ্যাসাগরেই চলো! —সেখানে ভর্তি হতে গিয়ে দেখেন তাঁর কাছে একটাকা কম আছে, ভর্তি হওয়া হলো না! বেরিয়ে এসে সেই শিক্ষকের সঙ্গে দেখা। 'সুশীল, এখানে কেন?' —তিনিই বললেন, তার জন্য রিপন কলেজের সায়েন্স বিভাগে তিনি বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, হোস্টেলের জায়গাও ঠিককরা। 'সুশীল, রিপন ছেড়ে কেন যাবে?'…যাঁকে ভয় পেতেন দেখেন তিনি কত কোমল, কত স্নেহশীল! মিথ্যে ঐ কাঠিন্য! তবু নিজেকে কাঠিন্যের খোলসে মুড়ে রাখলে কত ভুল বোঝাবুঝি যে হয়!…সেদিনই ঠিক করেন শিক্ষক হবেন; তবে শাসনকর্তা নন। স্নেহে কাছে টেনে নেবেন, সোহাগে নয়!—নিজেকে দেওয়া নিজের এই প্রতিশ্রুতিটি আজীবন তিনি মেনে গেলেন। মেনে যাচ্ছেন!

ঘোষ ট্রাভেলিং স্কলারশিপ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মিশৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে এসেছেন। আর ফিরে এসে, নিজের লেবরেটারিকে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফিজিকেল কেমিস্ট্রির গবেষণায় মেতে গেলেন। নিজে কাজে মাতলেন আর তাঁর উৎসাহ সঞ্চারিত হলো ছাত্র-শিক্ষক মহলে। ছাত্র গবেষকদের কাছে তিনি সেদিন প্রথম আখ্যা পেলেন ফ্রেণ্ড-ফিলজফার-গাইড—বন্ধু উপদেষ্টা দিশারী বলে। এই আখ্যাটি গায়ের চামড়ার মত এখনো তাঁকে ঘিরে আছে ; রেহাই পান নি ;

১৯৫৭ সালে ইউনেস্কোর কনসালটেন্ট হিসেবে ইন্দোনেশিয়া গেলেন। সুমাত্রার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে শিক্ষকতা। আর তখনই ছাত্রদের সান্নিধ্যে নিজেকে আরো নিয়ে যেতে ইন্দোনেশীয় ভাষা শিখে ফেলেন। শেখা মানে সেই ভাষায় কথা বলা, প্রবন্ধ অথবা পুস্তক লেখা, অনুবাদ করা! একই ভাবে নিজে নিজে শিখলেন জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও রাশিয়ান। এছাড়া আছে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় জ্ঞান। রসায়নের অধ্যাপক এবং সায়েন্স ফ্যাকল্টির ডীন হয়ে যোগ দেন। চার বছর সেখানে কাটিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি রসায়নের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে নতুন গড়ে তোলা অধ্যাপকের পদটি গ্রহণ করে ফিরে আসেন। '১৯৬৫ থেকে ৬৮—কয়টি আনন্দ-সুখভরা বছর। তারপর তাঁকে প্রশাসন বিভাগ টেনে নেয়। ৬৮ সালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। কার্যকাল শেষ হবার আগে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকাল্চারের পূর্ণ সদস্য করে ডেকে নেয়। ১৯৭০ থেকে ৭৬—পাঁচ বছর রইলেন দিল্লী। আবার ফিরলেন কলকাতায়—এবার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টার তিনি। এক বছরের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে যোগ দিলেন। আর ১৯৭৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবসর নিলেন। তার পরদিন, তাঁর পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন থেকে শুরু হলো অন্য এক অবসরহীন কর্মব্যস্ত দিন। এতদিন নির্দিষ্ট বিভাগে নিজেকে আটকে রাখতে

পেরেছিলেন। আর ১৯৭৯ সাল থেকে শুরু হলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিস্তৃত হয়ে থাকা। নিজের জন্য যে সময়টুকু তিনি এতদিন রাখতে পেরেছিলেন—সেটুকুও তিনি অন্যের কাজে বিলিয়ে নিঃস্ব হয়ে রইলেন। বলতেন মৃত্তিকা রসায়নের উপর একটা প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক লিখবেন। আর আজও বলে চলেছেন, নোট-টোট সব যোগাড় হয়ে আছে। একবার বসতে পারলেই হবে !···বসতে পারলে তো !

জীবনে বহু সম্মান তিনি পেয়েছেন। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাদমির তিনি ফেলো। ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা চারটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বহুবার গেছেন তিনি। গেছেন রাশিয়াতে। বুলগেরিয়ার ভার্নাতে বিশ্ববিজ্ঞান-সাধক সম্মিলনে যোগ দিলেন ; বিধ্বংসী নিউট্রন বোমা আর মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। কানাডায় উপাচার্য সম্মিলনে যোগ দিলেন !···সব ঘোরাঘুরির শেষে, ফিরে আসেন যোধপুর পার্কের ছয়তলার বই-ঠাসা, পত্র-পত্রিকা ভরা খোলামেলা ফ্ল্যাটটিতে। যেখানে অধিকাংশ দিন দরজার বেলটি খারাপ থাকে, টেলিফোন বোবা, লোডশেডিং এর জন্য লিফট্ অচল, অথবা নির্জল দিন। তবু এখানে এসে হাঁফছেড়ে এলোমেলো অগোছালো হয়ে থাকতে পারেন। অসংখ্য ফাইলের মধ্য থেকে ঠিক বের করে নিতে পারেন দরকারী কাগজটি। আর প্রয়োজনের সময় ছোট পকেট ডায়রিটি বার করে তাঁর নিজস্ব ক্ষুদে ক্ষুদে, এবং হয়তো বা, সাংকেতিক অক্ষরে লেখা সময়সূচীটি দেখতে পারেন ! বাড়িতে অনেক কিছু বাড়ন্ত থাকলেও, অতিথির জন্য চা ও মিষ্টির অভাব থাকে না এবং তাঁর এন্‌গেজমেন্ট্ ডায়রিতে কোনো ফাঁক নেই !

স্ত্রী ডঃ কৃষ্ণকামিনী রোহতগী মুখার্জি এবং একজন বিশুদ্ধ পূর্ব বাংলাভাষী বৃদ্ধা পরিচারিকা—যিনি বকলমে এঁদের অভিভাবিকা—এনিয়ে সংসার। তিনজনই মিতাহারী নিরামিষাশী, মিতবাক। বাড়িতে শব্দ, যা জোরে শোনা যায়, তা দরজার খটখটানি,—কেউ

একজন হয়তো এসেছেন ; অথবা টেলিফোনের ঝনঝনানি—কেউ হয়তো কথা বলতে চাইছেন ! আর তখনই নানা কাগজের স্তূপ থেকে অধ্যাপক বের করবেন আগন্তুকের প্রয়োজনীয় কাগজটি অথবা ক্ষুদে ডায়রি দেখে জানাবেন কবে সময় আছে !

কোনো কাজ গ্রহণ করলে, তাকে আত্মস্থ না করে তাঁর শান্তি নেই। রবীন্দ্র ভক্ত তিনি। অন্যদিকে আইনস্টাইন তাঁর আপনজন। কখনো কখনো অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা উদ্ধৃত করে বলবেন, তিনি বলতেন অরিজিন্যাল লেখা না পড়লে লেখক বা বিষয়কে স্পষ্ট বোঝা যায় না। অতএব অরিজিন্যাল লেখা না পড়ে, তিনি কোনো নিবন্ধে হাত দেবেন না! শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে রচনায় তিনি লিখলেন জ্ঞানের শীর্ষবিন্দু সমাধি। এখানে তিনি যেন আইনস্টাইনীয় তত্ত্বের সৃষ্টিলয়ের বিন্দু সিঙ্গুলারিটির কথা বললেন—যা অবোধ্য, যাকে প্রমাণ করা যায় না বলে আইনস্টাইন এটিকে এড়াতে চেয়েছেন। ডঃ মুখার্জি জানেন, এড়ানো যায় না ! যারা আসবার তারা আসবেই ; অবাঞ্ছিত অপরিচিত হলেও তারা আসে। এরা বিজ্ঞানের তথ্য। এদের ইতিবৃত্ত, না বুঝলে না জানলেও, লিখে যেতে হবে ! একবার তিনি বললেন, 'আসলে আমাদের দুর্ভাবনা মানুষকে নিয়ে। বিজ্ঞান বা ধর্ম যাই হোক, সব কিছু তছনছ করার ক্ষমতা কিন্তু এদের থাকছে। কী যে অস্বস্তি !'

আবার বসুবিজ্ঞান মন্দিরের হীরক জয়ন্তী উৎসবের 'প্রাণ-ম্যাটার ও অণু' নামের সিম্পোসিয়ামের উদ্‌বোধনী ভাষণের শেষে বললেন, "জ্ঞানের সীমা জানা নেই। শুধু জানা আছে স্বাধীন বিমুক্ত অন্বেষণের পথে এই অজানা একদিন নিজের থেকে ধরা দেয়। কোনো নিয়ন্ত্রণের সাধ্য নেই সত্যান্বেষীর পথ-যাত্রায় বাধা তোলার। খোঁজার পথে মানুষ এগিয়ে যাবে !"

এই মানুষরা দলছুট নয়। এঁরা সেই বিশিষ্ট মহিমান্বিতের দল, সব ক্ষুদ্রতাকে তুচ্ছ করে যাঁরা মাথা তুলে ঊর্ধ্বে দাঁড়াতে পারেন।

এ সেই বনস্পতি—যার বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় অনেক আশ্রয়ের আমন্ত্রণ !

এই মানুষের স্বপ্ন ডক্টর সুশীল মুখোপাধ্যায় দেখে থাকেন। এদের কথা বলে থাকেন। এই স্বপ্ন দেখা, এই স্বপ্নের বর্ণনা করা, বোধকরি, তাঁর পক্ষেই সম্ভব !

তবু তাঁর কাছে যেমন আমাদের চাওয়ার শেষ নেই, নালিশেরও শেষ নেই।

ন্যাশনাল সিম্‌পোসিয়াম্ অন আয়ন্ একসচেঞ্জ ফেনোমেনানের উপলক্ষে যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় সেখানে তাঁকে জানানো হলো একজন আদর্শ শিক্ষক, একজন ভারতীয় গুরু বলে। ভারতীয় গুরু থাকেন স্মৃতিতে, শ্রুতিতে ; থাকেন শিক্ষকতার বহতা ধারায়। তবু আধুনিক গুরুর যে অন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকে। সে দায়িত্ব হলো নিজের চিন্তাটিকে ভবিষ্যতের কাছে ব্যক্ত করা—লিখে যাওয়া, রেখে যাওয়া ! অথচ লেখার ব্যাপারে কেন তিনি এত কৃপণ ? তাঁর গবেষণার কাজ বিদেশী লেখকরা তাঁদের টেকসট বই—পাঠ্যপুস্তকে স্থান দিয়েছেন। চল্লিশের উর্ধ্ব সংখ্যক গবেষক তাঁর সহায়তায় পি. এইচ. ডি. পেয়েছেন। শতাধিক পেপার তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এগুলি ছড়িয়ে রইল। এদের তিনি একসুত্রে গেঁথে ভবিষ্যতের বিজ্ঞান সাধকদের হাতে দিয়ে গেলেন না। হয়তো এটি আমাদের অকর্মণ্যতা, আমাদেরই গাফিলতি ! তবু, তাঁকে ছাত্ররা বলেছেন কর্মযোগী—তিনি কেন উদ্যোগী হলেন না ? তাঁর তো কারু প্রতি কোনো অভিমান বা নালিশ নেই। আর তাঁর মৃত্তিকা রসায়ন নিয়ে বই লেখার অভীপ্সা—সে কি কল্পনা—অথবা স্বপ্ন হয়ে থাকবে ? এখানে তাঁর দাক্ষিণ্য প্রকাশে কেন এত দীনতা ?

আর তাঁর সৌজন্যবোধ-স্বাভাবিক ভদ্রতা ! এরই ফলে তিনি সময়-হারা হয়ে আছেন। চেনা-জানা সব প্রতিষ্ঠানের, সব কাউন্সিলের

তিনি সভ্য। আর একবার সভ্য হলে তিনি ক্যাথলিকদের মতো নিজেকে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়োজিত করে রাখেন। তিনি সদা সতর্ক সক্রিয় সভ্য। একবার পরিহাস করে তাঁকে বলা হয়েছিল, এমন একটা প্রতিষ্ঠান করতে হবে, যার প্রথম শর্ত হবে যে ডক্টর সুশীল মুখোপাধ্যায়ের এখানে প্রবেশ নিষেধ। এমন কি, তাঁর স্ত্রীর জন্যও দ্বার নিরুদ্ধ থাকবে যাতে সেই সুযোগে তিনি না আসতে পারেন। ডক্টর রোহতগী মুখার্জি বলেছিলেন, এমন প্রতিষ্ঠান করা যাবে না। উনি ঠিক আসবেন! আর আচার্যদেব শুধু হাসলেন—ভাবটা যেন আমাকে আটকানো এত সোজা নয়!···এই সৌজন্যবোধে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেন, তাতে মনে হয় তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে মিশছেন;—এও তো অস্বস্তির! ভারতীয় গুরু তাঁর ছাত্রদের সন্তানের মত দেখতেন। সেখানে ছিল স্নেহের স্পর্শ। স্নেহ ছিল বলেই শাসন করার অধিকার তাঁর ছিল। কিশোর বয়সে শাসন না করার যে শপথ তিনি নিলেন, তাই তাঁকে সৌজন্যের পথে নিয়ে গেল। তবু কাঠিন্য যেমন পরিচয়ের বাধা, সৌজন্যবোধেও যে দূরত্ব গড়ে ওঠে! তাঁকে দূরে রাখতে মন চায় না; অথচ কাছে যেতে যে ইতস্ততা জাগে! স্নেহশীল মনটিকে কেন তিনি উদাসীন শিষ্টাচারের মোড়কে মুড়ে রাখেন?

তবু সব নালিশ নিয়ে যখনই তাঁর কাছে যাওয়া যায়, তখনই তাঁর চোখের স্মৃতিতে পরিচয়ের যে ইঙ্গিত ভেসে ওঠে—সারা মুখে মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে যায়! তখন মনে হয় বোধি ও মননের সমন্বয়ে হৃদয় আর মস্তিষ্ক ঐখানে বুঝি ঐকতান তোলে! যে প্রশ্ন নিয়ে ছাত্ররা জর্জরিত হয়েছে—সহসা তার উত্তর ভেসে ওঠে। অথচ, তিনি তো কোনো কথা বলেন নি!···তাঁর শিক্ষকতা বৃত্তির সার্থকতা এখানে। ছাত্রদের চিন্তার সুরবাহারে দূরে, নীরবে থেকেও, ঝঙ্কার তুলতে পারেন! এ এক আশ্চর্য বিস্ময়! অনাবিল আনন্দও এ!

তাঁর যৎ সামান্য লেখাতেও সেই বিস্ময়, আর আনন্দের স্ফুরণ!

কলিকাতা

সাধন দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

মানুষ

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চিন্তা

রবীন্দ্রনাথ কবি, সাহিত্যিক ও দ্রষ্টা ঋষি। সৃজনী শক্তির এমন ব্যাপক বিকাশ ক্কচিৎ দেখা যায়। কাব্য, সংগীত, নৃত্যকলা, ছবি-আঁকা, ছোটগল্প, বড়োগল্প, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পত্রাবলী, উপন্যাস, নাটক, গীতিনাট্য, প্রবন্ধ, ধর্ম, মানবিকতা, শিশুসাহিত্য, হাস্যকৌতুক, শ্লেষাত্মক রচনা—যে দিকে তাকাই দেখি রবীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি, প্রতিভা এবং স্বকীয়তার পরিচয়। তিনি একটি পরম বিস্ময়!···সাধারণ মাপকাঠিতে তিনি বিজ্ঞানী নন, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা ও চিন্তা তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা সম্পর্কে কিছু জানানোর দায়িত্ব আমাদের আছে। বিজ্ঞান শিক্ষা যা লাভ করেছি জানার তুলনায় তা যে নগণ্য তা জানি। সবই যে বুঝি অথবা হৃদয়ঙ্গম করি তা বলা চলে না। বিজ্ঞান শিক্ষা এক, তাকে অনুভব করা অন্য। আমরা অধিকাংশই বিজ্ঞানের তথ্য আহরণ করি। তাকে চিন্তায় ও কাজে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করতে শিখি না, সেখানে প্রয়োজন অনুভূতির। সেই অনুভূতির অভাব আছে বলেই স্বাভাবিক ভাবে মন দ্বিধাগ্রস্ত।

সম্যক অনুশীলনের পথে বিজ্ঞান কেবল জানাই যায় না, তাকে জীবনের সর্ব কাজে প্রয়োগ করাও চলে। এই শেষোক্ত বিষয়ে যাঁরা পারদর্শী তাঁদের বলা যায় বৈজ্ঞানিক। আর যাঁদের ক্ষমতা জ্ঞানার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদের বলা যায় বিজ্ঞানী। সারকথা, বিজ্ঞানী মাত্রই বৈজ্ঞানিক নন। অনেক বিজ্ঞানী অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, সেরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

যাঁর মন অনুসন্ধিৎসু, যিনি যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁকেই বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক অথবা বিজ্ঞানসাধক বলা যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তির সঙ্গে সৃজনীশক্তির যোগে নতুন আবিষ্কার সম্ভব। এই অনুসন্ধান কেবলমাত্র বস্তুতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, নানা বিষয়েই গবেষণা ও সৃষ্টিকার্যে তার বিকাশ ও প্রকাশ। নতুন নতুন ছন্দ রচনা, রাগসংগীত রচনা, নাটক, নৃত্য রচনা ইত্যাদির মধ্যেও সৃজনী-শক্তিব স্ফুরণ প্রতিভাত হতে পারে। একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বুঝতে পারি, যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভেতরেও তেমনি অনাদি-কাল থেকে একটা সৃজন চলছে।" (আত্মপরিচয়, ১ম খণ্ড, ১৭২)

কিন্তু বিজ্ঞান বলতে চলতি ধারণায় বুঝি পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞান-সম্ভার ও তার প্রযুক্তি; কারণ জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছু উৎপাদনের মূলে, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পিছনে রয়েছে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-সাধনা। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সকলের মধ্যেই কমবেশি বিজ্ঞান মনোভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কাব্য সাহিত্য ছন্দ রচনাশৈলী নিয়ে বহু পরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। এই বিষয়ে বহু বিদগ্ধজন তাঁর রচনার এই বহুমুখীনতার আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর বহুপ্রসারিত সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল। এর আগে ও পরেও হয়েছে এবং হচ্ছে। ঐ অনুষ্ঠানে তাঁর বিজ্ঞানচিন্তাও স্থান পেয়েছিল। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীপরিমল গোস্বামী এই বিষয়ে বিস্তারিত একটি বড়ো তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। সেটি 'রবীন্দ্রায়ণ' গ্রন্থে স্থান পায়। আরও অনেকে নিশ্চয় লিখেছেন; কিন্তু সব কটি সংকলন বা রচনা পড়বার সুযোগ আমি পাই নি। অনেকের ধারণা হতে পারে,

যেহেতু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে আলোচনা আমার পক্ষে দুষ্কর নয়। লেখার আগে পর্যন্ত আমারও এই রকম আইডিয়া ছিল। প্রস্তুতিপর্বে সেই ধারণা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। লেখার বিষয়টি যত সহজসাধ্য মনে হয়েছিল, ততটা যে মোটেই নয়—একথা স্বীকার করছি।

বিশ্বপরিচয়ের উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"পাণ্ডিত্য নেই সুতরাং সেটাকে বেমালুম করে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয় নি।" (বিশ্বপরিচয়, ৭)

সাহিত্যের মহারথীদের সম্মুখে আজ কিছু বলতে গিয়ে মনে হয়েছে আমার অপটুতা ধরা পড়বেই, কিন্তু তা যে কতখানি শ্রোতাদের পীড়াদায়ক হবে এই চিন্তায় পীড়িত বোধ করছি। অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা আছে, দ্বিধা হচ্ছে রবিবাসরের সম্মান রক্ষা হয়তো হবে না। এই আশঙ্কায় আমি নিঃসংকোচে যেখানে দরকার বোধ করেছি রবীন্দ্রনাথকেই টেনে এনেছি। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা তাঁর লেখা দিয়েই সম্পন্ন করেছি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর পদ্ধতি গ্রহণ করেও জানি, ভুলত্রুটি থাকলো আমার সংকলনের।

বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তা ও মত স্পষ্ট ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নানা উপলক্ষে ব্যক্ত করেছেন। কাব্যসৃষ্টি তাঁর প্রধান প্রেরণা হলেও সমাজ ও দেশ সেবা আর সত্যিকারের মানুষ তৈরির কাজ তাঁর মনকে আঁকড়ে রেখেছিল। তিনি প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতি অপছন্দ করতেন, কারণ মানুষের মনুষ্যত্ব তাতে পদে পদে বাধা পায়। বিজ্ঞান শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু সেই পথে না গিয়ে তিনি যতখানি বিজ্ঞানশিক্ষা করেছিলেন তা বেশির ভাগই নিজের প্রচেষ্টায়। পঠিত বিষয় সহজে বোঝার জন্য মাঝে মাঝে কিছু পরীক্ষা করেছিলেন ; কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

একজন তথাকথিত বিজ্ঞানীর সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে কিছু বলা অনেক বেশি সহজ, কারণ তাঁর প্রকাশিত

প্রবন্ধাদির মধ্যে সবটুকু তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার বেশির ভাগই নানা প্রবন্ধে টুক্রো টুক্রো হয়ে ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর সংগ্রহকার্য শুধু দুরূহ নয়, প্রায় অসম্ভব। অতএব যা-ই বলা হোক অভাববোধ যে থেকেই যায়!

এই প্রসঙ্গে প্রারম্ভিক পর্বে আর একটি বিষয়ও বলা দরকার মনে করি। কাব্যসাহিত্য, চারুকলা, সংগীত ইত্যাদি প্রায় একক প্রচেষ্টা। একাধিক ব্যক্তি একত্রে কবিতা কিংবা সংগীত রচনা করেছেন, তার নজির জানা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানসাধনার বেশীর ভাগই কিংবা সবটাই যৌথ প্রচেষ্টা। বিজ্ঞানে একক রচনা বা তথ্য আবিষ্কারের পিছনে পূর্বস্মূরী বিজ্ঞানীদের অবদান থাকতে বাধ্য। সেইজন্যেই একজন বিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে বুঝতে গিয়ে অন্য বিজ্ঞানীর সমালোচনা বা সমর্থন কাজে লাগানো যায়। বিজ্ঞানের যে অলঙ্কৃত সৌধ তৈরি হচ্ছে, তাতে কত বিজ্ঞানী যে লোহা, চুন সুরকি, ইঁট, কাঠ যোগান দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এভারেস্ট শীর্ষে যে-ই পৌঁছাক তার পিছনে যে সহায়ক দল রয়েছেন তাঁদের তো অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু চেষ্টায় ধাপে ধাপে বিজ্ঞান অগ্রসর হয়। যিনি আবিষ্কর্তা তিনি অধিকতর সারবান তথ্যগুলি বেছে নিয়ে একটি নতুন আবিষ্কারের পথ খুঁজে নিতে পারেন। পাকা শিল্পীর মতন তুলির একটি শেষ আঁচড়ে এক সৌন্দর্যময় ছবি এঁকে ফেলেন।

রাতের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর লোক যুগ যুগ ধরে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। আকাশের তারা গ্রহ উপগ্রহ নিয়ে কত কাব্য, গল্প ও সাহিত্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। নক্ষত্রদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় ঘটে তাঁর পিতৃদেবের সাহচর্যে। তাঁর কথায়ঃ

"তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্ব মাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি

যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম—জীবনে এই আমার ধারাবাহিক রচনা; আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।" (বিশ্বপরিচয়, ৫)

এই প্রবন্ধই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় কেটেছেঁটে প্রকাশিত হয়। বোধ হয় এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত রচনা। অবশ্য অনামেই ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত বিজ্ঞানসংবাদ লিখতেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায়।

'স্বাদ' পাওয়াটাই বড়ো কথা। এই স্বাদ এতই তীব্র ছিল যে তিনি প্রবন্ধ লিখেই থেমে যান নি।

"জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বই তখন কম বের হয় নি। সার 'রবর্ট বল্'-এর বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস্, ফ্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি—শাঁসসুদ্ধ, বীজসুদ্ধ। তারপরে একসময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান এই দুইটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে"। (বিশ্বপরিচয়, ৭) .

'বিশ্বপরিচয়' পুস্তিকার উৎসর্গ পত্র থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হল তাতেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। 'স্বাদ' এবং আনন্দ পাওয়া এই দুইটিই হল আসল। যাঁরা বিজ্ঞানকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ক'জনের এই ভাব রয়েছে? অথচ কবি তাঁর

কবিত্বে এতটুকুও ঘাটতি হতে দেন নি। আজীবন তিনি যথাসাধ্য বিজ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করেছেন ও আনন্দরস পান করেছেন। তারই ফলশ্রুতি আমরা লাভ করেছি তাঁর অমূল্য রচনা 'বিশ্বপরিচয়'-এ। ছিয়াত্তর বছরের কাছাকাছি বয়সে তিনি বইখানি লেখেন, যার প্রস্তুতি বাল্যকাল থেকে। এই নিষ্ঠার তুলনা হয় না। বিজ্ঞান বিষয়ে বই পড়তে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ পেতেন, বিজ্ঞানকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর লেখার মধ্যে প্রচুর বিজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে। পরিমলবাবুর প্রবন্ধটিতে এই ধরনের বহু সংকলন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের যুগে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানের প্রভাব থাকে, থাকতে বাধ্য। সুতরাং সব লেখকের লেখার মধ্যে অল্পবিস্তর বিজ্ঞানের বিষয় নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় মত আমরা সকলেই জানি। বিজ্ঞানশিক্ষাদানও যে মাতৃভাষাতেই হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে তিনি নানা উপলক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। মনে হয় 'বিশ্বপরিচয়' লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষায় ভাষা সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের বিতর্কের প্রত্যুত্তর দেওয়া।

'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গ-পত্রে আর এক জায়গায় কবি লিখেছেন:

'আজ বয়সের শেষপর্বে মন অভিভূত নব্য প্রাকৃত তত্ত্বে—বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তা সব বুঝি নি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও তাই।" (বিশ্বপরিচয়, ৭)

"বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মত কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে 'যথালাভ'। এই বইখানা সেই যথালাভের ঝুলি, মাধুকরীবৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।" (বিশ্বপরিচয়, ৭)

আবার বলি, অনেক তথাকথিত বিজ্ঞানীই বিজ্ঞান থেকে চিত্তের পরিবর্তে দেহের খাদ্য সংগ্রহেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। যিনি রস সংগ্রহ করতে পারেন এবং তা থেকে মনের আনন্দের খোরাক জোটাতে পারেন, তিনিই তো প্রকৃত বৈজ্ঞানিক।

আরও একটা বিষয়ে তিনি তর্জনি নির্দেশ করেছেন। 'বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল'। এইটিই হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। আমরা বিজ্ঞান চর্চা করি কিন্তু অনেকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ—সায়েন্টিফিক্ টেম্পার বা অ্যাটিটুড্ গড়ে ওঠে না। স্বাদ আর আনন্দ না পেলে ঐ মেজাজটি আসে না। ঐ মেজাজটিই হল বিজ্ঞানচিন্তার মূল উপজীব্য—যার স্মৃতির আনন্দের নিবিড়তা বোধি ও মননকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে!

ছেলেবেলায় বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর কৌতূহল ছিল। কিন্তু হাতেকলমে কাজের সুবিধে হয় নি। ফুলের রং বের করতে বিফল হয়ে আর কখনও যন্ত্রে হাত দেন নি—"এমন কি সেতারে এস্রাজে তার চড়াই নি।" (জীবনস্মৃতি, ১০ম খণ্ড, ১৫৬) সীতানাথ দত্ত'র কাছে একই পাত্রের মধ্যে গরম জল ঠাণ্ডা জল ভেদ করে কীভাবে উপরে ওঠে তার চাক্ষুষ পরীক্ষা বালক রবীন্দ্রনাথের মনে বিস্ময় জাগিয়েছিল, আনন্দও দিয়েছিল। তেমনি বিপরীতভাবে দাগ কেটেছিল বিজ্ঞান পরীক্ষার একটি ভয়াবহ দিক দেখে। শবব্যবচ্ছেদাগারে একখণ্ড কাটা পা দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন। ঐ সময়েই কণ্ঠনলীর কৌশলরহস্য বোঝাতে গিয়ে মাস্টার মহাশয় (অঘোরবাবু) যখন পকেট থেকে একটি কণ্ঠনলী বের করে ব্যাখ্যা করতে গেলেন বালক রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ মনে ধাক্কা লেগেছিল। সেই কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতিতে' লিখেছেন:

'কথা কওয়ার আসল রহস্যটুকু যে সেই মানুষটির মধ্যেই আছে, কণ্ঠনলীর মধ্যে নেই, দেহব্যবচ্ছেদকালে মাস্টার মহাশয় বোধ হয় তাহা খানিকটা ভুলিয়াছিলেন। এইজন্যই কণ্ঠনলীর ব্যাখ্যা সেদিন বালকের

মনে ঠিকমত বাজে নাই।”······“কথা কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুক্‌রো করিয়া দেখা যায় ইহা কখনও মনে হয় নাই। কলকৌশল যত বড়ো আশ্চর্য হউক না কেন, তাহা ত’ মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে।” (জীবনস্মৃতি, ১০ম খণ্ড, ২৩)। এইখানেই কবি-মনের সঙ্গে বিজ্ঞান-পদ্ধতির সংঘাত ঘটেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিজ্ঞানের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা হারান নি, আজীবন আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন।

‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন উপলক্ষে বলেছেন। একজায়গায় আছে :

“ভারতবর্ষে যদি সত্যি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি ‘বিশ্বভারতী’ নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।” (বিশ্বভারতী, ১১শ খণ্ড, ৭৪৭)

‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা বিষয়ে লিখেছিলেন :

“একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কাব্যক্ষেত্র; আহ্বান করেছিলুম এখানকার জলস্থল আকাশের সহযোগিতা।······এখানে প্রথম থেকেই বিরাজিত ছিল সৃষ্টির স্বত উদ্ভাবনার তত্ত্ব; আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত করে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।······কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা

কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়।" (আত্মপরিচয়, ১১শ খণ্ড, ২২২)। কবির মনের এই দিকটাই পরবর্তীকালে বহুভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞানের প্রতি কবির আগ্রহের সীমা ছিল না। তারই আর একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই বলি:

"কবির কল্পনাবিলাসী মনে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কত কথাই উঠেছে। ভাবছেন, সেখানে টেক্‌নিক্যাল বিভাগ খুলতে হবে; সেখানে ল্যাবরেটরি স্থাপিত হবে, রথীন্দ্রনাথ গবেষণা করবেন; ভালো একটা হাসপাতালের প্রয়োজন ইত্যাদি। ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতনে যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে সে স্বপ্নও দেখেছেন। প্রাচীন ভারতের কাষায়বস্ত্র পরিহিত ব্রহ্মচারীর আশ্রম-স্বপ্ন কি ভেঙ্গে গেছে? প্রাচীন ভারতের অবাস্তবতা থেকে কবির মন ক্রমশই মুক্তি পেয়ে আধুনিক হয়ে উঠেছে; য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের এটাই হল প্রত্যক্ষ ফল। ভারতীয়েরা যে পাশ্চাত্ত্য জাতির সমতুল্য নয় এইটা পদে পদে অনুভব করছেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে তাদের সমতুল হতে না পারলে বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন সে পাবে না, এই ভাব থেকেই কবি আজ শিক্ষাসমস্যাকে দেখছেন এবং শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে হবে ভাবছেন।

"আমেরিকা থেকে বহু চিঠি লিখেছেন, বহু বই পাঠাচ্ছেন শিক্ষা-সমস্যা ও শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে—বিজ্ঞানের বই বেশী। কবির ইচ্ছা বিজ্ঞানসম্পর্কে বইগুলি পড়ে কেউ ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দেন। ছাত্রদের বিজ্ঞানশিক্ষা দেবার ঝোঁক তাঁর শুরু থেকেই। ল্যাবরেটরি স্থাপনের পরিকল্পনা এই জন্যই। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের জন্য যখন ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয় তখনো ভারতের কোন

দেশীয় স্কুলে বিজ্ঞান পড়াবার জন্য বিজ্ঞানাগার ছিল না। জগদানন্দ রায় ছিলেন এর কর্ণধার।" (রবীন্দ্রজীবন কথা, ১৩০)

১৯২২ সালে আমেরিকা থেকে কবি এই মনোভাবই প্রকাশ করেন:

"আমার ইচ্ছা ওখানে এক একটা ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন, তা হলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাদান করা।" (রবীন্দ্রজীবন কথা)

আমেরিকা ও য়ুরোপের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য যে বিজ্ঞানসাধনা ও তার উপযুক্ত ব্যবহারেরই ফল তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের দারিদ্র্য-মোচনের একমাত্র উপায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও তার প্রয়োগ। জগৎকে ভারত দিতে পারে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ, তার দর্শন; কিন্তু ভারতকে প্রথম হতে হবে স্বাবলম্বী, বৈষয়িক সম্পদে যথেষ্ট শক্তিশালী। তা হলেই ভারতের বক্তব্য ও মন্তব্য সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে, সম্মান করবে। বিবেকানন্দও ঐ কথাই বলেছিলেন: খালিপেটে ধর্ম কর্ম হয় না।

সোভিয়েত য়ুনিয়নে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষায় বিজ্ঞানের অভাব স্বীকার করেছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন: "আমাদের ছাত্রদের একটি জিনিস কেবল দিতে পারি নি তা হল গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তার কারণ বিপুল খরচ, আমাদের দরিদ্রদেশে তার সংস্থান খুবই কঠিন।" (সোভিয়েট য়ুনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, ৪০)

"ভারতবর্ষের মানুষ কৃষিজীবী। এদেশে আপনাদের যে সাহায্য ও উৎসাহের প্রয়োজন ছিল ভারতীয়দেরও তারই প্রয়োজন। সম্পূর্ণ-রূপে কৃষির উপর নির্ভর করে এই বেঁচে থাকাটা যে কত সংকটজনক তা আপনারা জানেন। জানেন কৃষকদের পক্ষে জীবনের বর্ধিত দাবি মেটানোর জন্য শিক্ষা ও ফসল উৎপাদনের আমলী পদ্ধতির জ্ঞান কী একান্ত প্রয়োজনীয়।" (সোভিয়েট য়ুনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, ৬৮)

আজ দেশের বিজ্ঞানীরা যে গ্রামীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের

কথা বলে চলেছেন গভর্নমেণ্টও যার উপর জোর দিচ্ছেন সেই কথাটি রবীন্দ্রনাথ প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন।

বিজ্ঞানের প্রতি যেমন রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল, বিজ্ঞানীদের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। সীতানাথবাবু ও অঘোরবাবুর সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁরা বালক রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-বিষয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন তা স্বীকার করেছেন। বিজ্ঞানীদের প্রতি কবির শ্রদ্ধার মনোভাবের সুন্দরতম প্রকাশ দেখতে পাই জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের পত্রাবলী থেকে এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। জগদীশচন্দ্র মূলতঃ বৈজ্ঞানিক; কিন্তু তাঁর কবিমনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁদের বন্ধুত্বের ভিত্তি ছিল পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিসীম শ্রদ্ধার দ্বারা অভিষিক্ত। শিলাইদহের বাড়ীতে রেশম কীটের চাষ থেকে আরম্ভ করে গভীর বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক আলোচনার মধ্যদিয়ে এই শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার কাজে বিদেশ ভ্রমণের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সেই সময়ে তাঁর নিজের সঙ্গতি ক্ষীণ থাকায় তিনি ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর দেবমাণিক্যের নিকট অর্থ সাহায্য চাইতে দ্বিধা করেন নি।

"জগদীশবাবুর জন্য কিছু করার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধা তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের ক্ষোভের ও লজ্জার সীমা থাকিবে না।····· আমার একান্ত আন্তরিক ইচ্ছা মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি রক্ষা করিবেন।"

(জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত, ৯০)

ত্রিপুরাধিপতি অবিলম্বে কবির অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং জানাইলেন: "বর্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু' একপদ অলঙ্কার না-ই বা হইল"। (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত, ৬৮)

জগদীশচন্দ্রের হতাশা ও অনিশ্চয়তাব্যঞ্জক চিঠি পেলেই রবীন্দ্রনাথ উৎসাহপূর্ণ উত্তর দিতেন।

"কোন্ দিক দিয়া তিনি (ঈশ্বর) আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোক শিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্বলিত কর। বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই।...তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে।" (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত ৮৫)

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা যাতে বাঙ্গালী পাঠক সমাজ জানতে পারে তারজন্য তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। বঙ্গদর্শনে একাধিক প্রবন্ধ জগদীশচন্দ্র ও তাঁর গবেষণা নিয়ে লেখা। ভগিনী নিবেদিতা লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে জানাতেন। তিনি বঙ্গদর্শনে বাংলায় লিপিবদ্ধ করতেন। জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি-কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে। কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার, দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেইজন্য বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটতো। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না। কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেইজন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলতো দুই দিকের দুইখানা জানলা দিয়ে।" (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত, ২২৯)

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি এই উপলক্ষে বলেছেন :

"জীবনের বহুবিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি (রবীন্দ্রনাথ) আমাকে প্রতিদিনের সখ্য ও সাহচর্য দান করিয়াছেন।" (জগদীশচন্দ্র বসু, ১ম খণ্ড জীবন চরিত ২১২)

সেকালের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিখ্যাত রসায়নবিদ্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি কবির গভীর স্নেহের পরিচয় 'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গ পত্রেই পাওয়া যায়। ঐ পুস্তিকাটিতে মেঘনাদ সাহার সম্পর্কে তাঁর সস্নেহ উক্তিও উল্লেখ করার। রাজশেখর বসুকে বিশ্বভারতীর ভিতর টানবার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি আই. এস্. সি. ক্লাসের ল্যাবরেটরির দরজায় পাথরের ফলকে 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন' লিখিয়েছিলেন। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি মনে প্রাণে এত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি স্ত্রীর গহনা বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা নগেন্দ্রনাথের আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা পড়াবার ব্যাপারে কোনো দ্বিধাবোধ করেন নি।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবন কথা'র এক জায়গায় লিখেছেন :

"কবির বিশ্বাস বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।"

বিশ্বপরিচয়ের উৎসর্গ-পত্রেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে :

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।" (বিশ্বপরিচয়, ১)

"এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেরও শিক্ষা দিয়ে চলতে

হয়েছে। এই ছাত্র মনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।" (বিশ্বপরিচয়, ১)

বিজ্ঞানশিক্ষা ক্লাসের কক্ষে কিম্বা গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে কখনই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। তাকে দৈনন্দিন জীবন স্থাপনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে।

"ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে (ছাত্র) অনেক মার খেয়ে শিখেছে। একথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে-নদী দুই-বেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোল-বিবরণের নদী তার বহু দুঃখের এগ্‌জামিন-পাসের নদী।" (শান্তিনিকেতন, ৩২৪)

আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষা এখনও বেশির ভাগই ঐ পরীক্ষা-পাসেব জন্য। যা পড়ছে তা কোথাও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে না। এখন ত' বিজ্ঞানশিক্ষা আবশ্যিক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত; তবু হাতে কলমে পড়া জিনিস যাচাই করার কোন ভালো ব্যবস্থা হলো না। তা ছাড়া বিজ্ঞানকে আমরা মুষ্টিমেয় লোকের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে যেতে পারি নি। সোভিয়েত য়ুনিয়নের অভিজ্ঞতা থেকে কবি বলেছেন:

"বিজ্ঞান শিক্ষায় পুঁথির পড়ার সঙ্গে চোখের দেখার যোগ থাকা চাই, নইলে সে শিক্ষার বারো আনা ফাঁকি হয়। শুধু বিজ্ঞান কেন অধিকাংশ শিক্ষাতেই একথা খাটে। রাশিয়াতে বিবিধ বিষয়ের ম্যুজিয়মের যোগে সেই শিক্ষার সহায়তা করা হয়েছে। এই ম্যুজিয়ম শুধু বড়ো বড়ো শহরে নয়, প্রদেশে প্রদেশে, সামান্য পল্লীগ্রামের লোকেরও আয়ত্তগোচরে।" (রাশিয়ার চিঠি, ১০ম খণ্ড, ৭০৮)

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের দৈন্য ও অবহেলার উল্লেখ করে তিনি লিখলেন:

"আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি। তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর

দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কলনিষ্ঠার পরিচয়।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৫৬২)

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান সাধনার পরিণতি হলো বস্তুজগতের নিয়ম আয়ত্ত করা। কবির কথায়ঃ

"বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়; বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে; সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছুতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।"

বস্তুজগতের উপর আপাত কর্তৃত্বই ক্ষমতার উৎস, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের সম্পদ, দরিদ্রতা মোচনের চাবিকাঠি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও হয়তো বা সার্থকতা।

মানুষের মনে অজানাকে জানার স্পৃহা অপরিসীম এবং প্রকৃতির কাছ থেকে আদায় করার প্রবৃত্তিও অদম্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

"মানুষের সবচেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে নেওয়া।······আসল কথা মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়।····· গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল জগতে যা-কিছু ঘটছে এ সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে। সেই যাদুমন্ত্রের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে; মান্‌বো না, মানাব।" (শিক্ষা ১১শ খণ্ড, ৬৬৫)

বিজ্ঞানশক্তিতে শক্তিমান পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানে অনগ্রসর প্রাচ্যের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

"এই জন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছা না করলেও মরতে পারি।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৬)

বিজ্ঞানলব্ধ শক্তিই য়ুরোপ এবং আমেরিকাকে পৃথিবীর রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা যুগিয়েছে।

"পশ্চিম দেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ করেছে কখন থেকে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে-নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৬)

আবার পোলিটিকস্‌ই দেশে দেশে বিভেদ ঘটিয়েছে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞান যোগসূত্র বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে।

"পশ্চিম মহাদেশ তার পোলিটিকসে্‌র দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলছে। সেইখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ, কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে।"

(বিশ্বভারতী, ১১শ খণ্ড, ৭৮৫)

বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতার উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে যে সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধানে বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে বিজ্ঞানীরাও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব অবস্থাকে দেখতে পারছেন না। যারা বিজ্ঞানের সহায়তাকে এড়িয়ে যেতে চায় তাদের উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে সন্ধান করতে চায় না, তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।"

(শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৬)

"পাড়ায় আগুন লাগলো কেন'র উত্তর এলো: 'কপাল'। কবি বললেন, 'কপাল' নয়, কুয়োর অভাব।"

প্রকৃতি তার সম্পদ ছড়িয়ে দিয়েছেন নানা দিকে নানা ভাবে। মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি। এই দুই-এর যোগে এই বস্তু জগতে সে যা চায় তা সে আয়ত্ত করতে পারবে।

'তিনি (দেবতা) তাঁর সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রে এই কথা লিখে

দিয়েছেন 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম; আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম। এই দু'য়ের যোগে তুমি বড়ো হও।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৬৭) বুদ্ধির নিয়ম পেতে হবে বিজ্ঞান সাধনার পথে।

'কপাল' না 'কুয়োর অভাব' এই মোহ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্বের নিয়মগুলিকে জানতে হবে।

"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার হাত থেকে কেবলমাত্র মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না।" (শিক্ষা, ১১শ ৬৬৭)

বিশ্বের নিয়মকে ছাড়িয়ে, বুদ্ধির নিয়মের বাইরে কিছুই কি নেই? যে-দেবতা এই বিশ্বের নিয়ম ও বুদ্ধির নিয়ম যোগে আমাদের বস্তুরাজ্যে আধিপত্য করার স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর কি আর কোন দায়িত্ব নেই, নির্দেশ কিছুই নেই, করার কিছুই নেই? রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান মানুষকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে, তার ক্ষমতা কতখানি সীমাবদ্ধ। এই বিষয় নিয়ে কবি অনেক কথা বার বার বলেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারাকে বোঝানো যেতে পারে।

"য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগলো তখন যেদিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মের পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭০)

মানুষ মনুষ্যত্ব লাভের সাধনায় তপস্যা করছে। এই তপস্যা তার দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্যও হতে পারে। এই তপস্যার মাঝে মানুষ

দেখে নানা বৈপরীত্য ও বৈষম্য। কিন্তু কবির কথায়, "এই সমস্ত প্রবণতা বিরুদ্ধতা বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোন একটা মাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।" (শান্তিনিকেতন, ১৩৩)

"মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ······আজ তার জ্ঞান অণু থেকে অণুতম ও বৃহৎ থেকে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬০২)

এইখানেই ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাধনার সংযোগ স্থাপন হয়তো সম্ভব। আপাত বিরুদ্ধতা এই সংযোগের পথে লয় পায়। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকেই প্রকাশ করেছেন নানারকমে।

"দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। ·········সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাপীঠ আজ শুক্রাচার্যের হাতে। ·········বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিমদুয়ারী বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও-ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে-বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড ৬৬৭-৬৮)

দু'য়ের সংযোগ ও সামঞ্জস্যসাধন ভারতবর্ষই করতে পারে।

"বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তা ভালোই, নইলে দুর্যোগ। সেই

মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগোল, এক করবার শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭৫)

"বাইরের বেগ অন্তরের ছন্দকে অত্যন্ত বেশী পেরোয় কখন ? যখন বহিঃ প্রয়োজনের বড় বাড় বাড়ে। তখন মানুষ পড়ে পিছিয়ে। কলের সঙ্গে সে তাল রাখতে পারে না। য়ুরোপে সেই মানুষ ব্যক্তিটি দিনে দিনে বহুদূরে পড়ে গেল। কল গেল এগিয়ে, তাকেই সেখানকার লোক বলে অগ্রসরতা। প্রোগ্রেস্।" (পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ১০ম খণ্ড, ৫৬৮)

বিজ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত নানা প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের মনটিকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এর থেকে উদ্ধার পাবো কি করে ? কবি তাই বলেছেন ঃ

"কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎ পরিচয়ের সামান্য একাংশ মাত্র—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি।"

(আত্মপরিচয়, ১০ম খণ্ড, ১৮০)

"য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞান সাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্য তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়—সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে ; জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।" (বিশ্বভারতী ১১শ খণ্ড, ৬৭৪)

"তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন না-জানাই বন্ধনের কারণ। জানাতেই মুক্তি। সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সে-ই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয় রাজ্যে আমরা যাহা বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া। এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞান।" (শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭৪)

কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপ্রতিহত প্রভাব থেকে পাশ্চাত্ত্য-দেশের মানুষ মুক্ত হতে পারছে না। ভারতবর্ষ সেই মুক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল। তাই কবির প্রার্থনা :

"ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি। কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে।"

(শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৭৭)

বস্তুরাজ্যের নিয়ম অন্বেষণ করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে জড়বাদ তার শিকড় দৃঢ় না করতে পারে তার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার, কারণ "বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর। সেই মানুষই বৈজ্ঞানিক সত্যলাভের অধিকারী সত্যকে যে শ্রদ্ধা করে পূর্ণমূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক ; প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্ত্যজাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেছে তাদের।"

(পারস্যে, ১০ম খণ্ড, ৭৫৬)

এই জয়ই কিন্তু কাল হয়েছে। জয়ের লোভে তামসিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে। এই জয়ের লোভেই য়ুরোপীয় ও আমেরিকার বিজ্ঞানসমাজ যে-কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে ভূরি ভূরি প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ফল বের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। কবির কথায় :

"বিজ্ঞানকে দিনে দিনে য়ুরোপ আপন লোভের বাহন করে লাগামে বাঁধছে।······এতেই মনুষ্যত্বের বিনাশ। এর কারণ যন্ত্র নয়। এর কারণ আন্তরিক তামসিকতা, লোভ হিংসা পশুবৃত্তি।" (পারস্যে, ১০ম খণ্ড, ৭৫৬) কবি এই মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন 'নৈবেদ্য'র একটি কবিতায় :

"শক্তি দম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।"

ভারতের তপোবনে যে 'প্রশান্ত সরলতা,' 'সমুজ্জ্বল জ্ঞান' ও 'শীতল সন্তোষ' বিতরিত হত তার অভাব ঘটেছে।

"·········আজ তাহা নাশি
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।"

(নৈবেদ্য, ১ম খণ্ড, ৯০৩-৪)

বিজ্ঞানের বিশুদ্ধসত্য আলোচনা করে তার সাধকের প্রতি মনের কোঠায় ভক্তির সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু লোভ হিংসা পশুবৃত্তি তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সে কল্পনাও কি ঠাঁই পায় না?

"·········য়ুরোপে বাধলো মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্বনাশের কাজে।······এত বড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয় নি। একেই বলি জড়তত্ত্ব; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত। বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।" (পারস্যে, ১০ম খণ্ড, ৭৫৭)

"যে-য়ুরোপ শক্তি পূজার বীভৎস আয়োজনে বিজ্ঞানের খর্পরে নররক্তের অর্ঘ্য রচনা করচে সেই য়ুরোপ পৌরাণিক—সেই য়ুরোপ জানে না বাহিরের যন্ত্র মনের দৈন্যকে তাড়াতে পারে না, যন্ত্রযোগে শান্তি গড়বার চেষ্টা বিড়ম্বনা।" (চিঠিপত্র, ৯ম খণ্ড)

আধিভৌতিক শক্তি যেটুকু সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছে তাকেই আত্মসাৎ করতে উদ্যত।

"মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়ি-পাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, 'আমার জ্ঞানের জোরেই এই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে'। কিন্তু এ জ্ঞান যদি তারই হত এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার

করে, বলে, 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি। কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পা-ও চলতে পারত না'।" (শান্তিনিকেতন, ৩৭১)

আইনস্টাইনের সঙ্গে কথোপকথন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি হতে হবে এমন, যাতে ব্যক্তিগত সীমা ও সংকীর্ণতা, ত্রুটি ও ভ্রান্তি বাদ দিতে দিতে বিশ্বমানবের মনে সত্যের যে-ধারণা সম্ভব সেই দিকেই আমরা যেতে পারি। কিন্তু বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পারছি মানুষে মানুষে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের ধারা সর্বপ্রসারী ও তীব্র হয়ে উঠেছে ; ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। মানসিক অশান্তি আর দুশ্চিন্তা জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য কত কথা আজ শোনা যায়। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা কতখানি বৈজ্ঞানিক ছিল নিচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়।

"পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে-বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখনকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতেখড়ি দিয়াছে ; ঘরের দেওয়ালে আমাদের পক্ষে ত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালে ফাঁক ; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে। আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ-সঞ্চয়ের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার' পরে।"

(শিক্ষা, ১১শ খণ্ড, ৬৩৮)

বিজ্ঞানের যুগে আমরা দ্রুতগতিতে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করছি, তার কুফলও ভোগ করছি। পরিবেশ কলুষিত করে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুলছি। অথচ প্রকৃতির যোগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চললে এ দশা হত না।

অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ নিয়ে আলোচনা চলছে। যে দৃঢ় প্রত্যয়কে মূলধন করে বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছিল তার ভিত্তিমূলে চিড়্ খেয়েছে ; ভাঙনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়াশুনা করেছেন এবং নিজের মতামতও প্রকাশ করেছেন ঃ

"বস্তুজগতের মূলভূতের উপাদান সংস্থানে মোটের উপর একটা বন্ধন আছে, সেইজন্যেই কার্বনটা কার্বন, অক্সিজেনটা অক্সিজেন। কিন্তু বহু দীর্ঘকালের ভূমিকায় আদি সূর্য থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টি সংঘটনের যে ব্যাপার চলছে তাতে সেইসব মূলভূতের মধ্যেও টানাছেঁড়া ঘটেছে ; সেটা ভেবে দেখতে গেলে সৃষ্টিটা অনাদিকালের ক্ষেত্রের অনন্ত মরীচিকার প্রবাহ। এতদিন বিজ্ঞান বলে আসছিল পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাঁধা নিয়মের সুদৃঢ় ধ্রুবসূত্র আছে। আজ বলছে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় ; থেকে থেকে অঘটন ঘটে। দুই-দু'য়ে পাঁচও হয় নিত্য এবং আকস্মিকের দ্বন্দ্ব সমাসে।"

(পথে ও পথের প্রান্তে, ১০ম খণ্ড, ৮৪২)

ভাবজগতের, বস্তুজগতের তত্ত্বালোচনা নিয়ে কবি এর বেশি কিছু বলতে চান নি। তাঁর মতে, "আমার কলমে শোভা পায় না।"

"আমার তো বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার-যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু একাদকে এই অনুভূতিতেই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর একাদকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়, যাকে দেখতে হবে সে জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে।.........এইজন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত এক পঙ্‌ক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার ; নইলে নিজের দ্বারা নিজেকে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয়।" (পথে ও পথের প্রান্তে, ১০ম খণ্ড, ৮৪৪)

বিজ্ঞানের অমিত শক্তির প্রভাবে বিজ্ঞানী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে

পড়েছে। কাছে থেকে নিজেকে অথবা তার সৃষ্টিকে বিচার করতে পারছে না। অহংকারের ভারে আসল সত্যদৃষ্টির বাইরে সরে গেছে। এই পঙ্‌ক্তি সরে দাঁড়ালে হয় তো কিছুটা প্রতীতি জন্মাতে পারে। নইলে বিজ্ঞানের সংকট থেকে বুঝি মুক্তি নেই।

বিজ্ঞান-প্রভাবিত যুগে সাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান সামান্য নয়। প্রত্যেক সাহিত্যকারের রচনার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের বিষয় যেমন সহজে স্থান অধিকার করে আছে তেমনটি আর কারোর লেখায় দেখা যায় না। বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে বিজ্ঞানের উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা বিজ্ঞানের চোখে দেখা তথ্য দিয়ে না-দেখা মনের ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে অথবা অসাধারণ উপলব্ধিকে সাধারণ গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করবো।

"উত্তাপ যদি সর্বত্র একাকার হইয়া যায় তাহা হইলে হাওয়া খেলে না, নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়াই পঞ্চত্ব পাওয়া।" (বাউলের গান)

বিজ্ঞানীরা এই একাকার অবস্থাকেই 'থার্মাল্ ডেথ্' আখ্যা দিয়েছেন। জেম্‌স্ জীন্‌স্ তাঁর 'মিষ্টিরিয়স য়ুনিভার্স' পুস্তিকাটিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয় প্রথমে বাষ্প ছিল, "পরে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল।·········সৌরজগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এক বিচ্ছিন্ন অথচ আকর্ষণ-সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্য তন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে।" বুদ্ধি, সমাজ ও কাব্যেও যে এই একই পদ্ধতি কাজ করে সেই কথাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথম কতকগুলো বিশৃঙ্খল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণীবদ্ধ কর ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল

পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পর প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা ; কবিতাতেও এই নিয়ম খাটে।

(কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন)

বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী আলাদা। বিজ্ঞান সাধারণত বাড়্তি কথা বলে না বরং একটি কথায় অনেককিছু বোঝানোর জন্য নতুন শব্দ চয়ন করে। তা ছাড়া গাণিতিক সংকেত ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ 'কনসেপ্ট'কে প্রকাশ করা হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞান দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে ; বিজ্ঞানের সব মহলে প্রবেশ হয়ে পড়ে দুর্গম অথবা আয়াসসাধ্য। সাহিত্যকার সেই আয়াস স্বীকার করে নিয়ে সাধারণের বোধগম্য করে বিজ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারে ; অন্যথা সাহিত্যের রসগ্রহণে পারঙ্গম বিজ্ঞানীকে এই দুরূহ অথচ প্রয়োজনীয় কাজে এগিয়ে আসতে হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দেখতে পাই প্রথমোক্ত পদ্ধতির সফল প্রচেষ্টা। পরিমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। 'বিশ্বপরিচয়'-এর প্রতিটি ছত্র সাহিত্যরসোত্তীর্ণ, আবার বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ।

"বিজ্ঞান বলে, সূর্যকিরণে অন্ধকার রশ্মিই বিস্তর। আলোক রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম। একটুখানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাত্র স্বরূপ।" (ধর্ম : জড় ও আত্মা)

বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জানা গেল যে, দেখা আলো না-দেখা আলোর তরঙ্গের তুলনায় খুবই কম। অর্থাৎ না-জানা না-দেখা জিনিসের যেন সীমা নেই। ক্রমশ বিজ্ঞান এই না-দেখা মহলের খবর জানতে পেরেছে—একদিকে মাইক্রোওয়েভ্, রেডিও তরঙ্গ, অন্যদিকে গামা রশ্মি, একস্-রে ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও হয়ত বহু না-দেখা তরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় নি। দেখা অংশ বাস্তবিকই 'মুখপাত্র স্বরূপ', কারণ ঐ না-দেখা অংশের গুণাগুণ দেখা অংশেরই মত।

"এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয়,

তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেন্ট্রিফ্যুগল'—এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন।" (পাগল)

এখানে 'পাগল' কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। বিবর্তন কাজ করে যেন আপাত এলোমেলো বা লক্ষ্যহীন পদ্ধতিতে, অর্থাৎ 'পাগলের খামখেয়ালে'। প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার পথে প্রায় আচমকা একটি সুশৃঙ্খল সৃষ্টির সূচনা করে।

দুটির মিলনেই সৃষ্টি এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি কবির ভাষায় কী অনবদ্য হয়েছে ঃ

"সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটির মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়।
পাখীর সংগীত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা। (মহুয়া, সঞ্চয়িতা, ৬০৪)

কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব উপমার সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা সকলেই করে থাকেন। সাধারণতঃ ক্বচিৎ উপমা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন হয়। উপমাটি যদি বিজ্ঞানের সত্যকে লঙ্ঘন করে তাহলে ত্রুটি রয়ে গেল, কিন্তু যদি সেটি সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয় তা হলে ত্রুটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এরকম সামান্য ত্রুটি আছে এমন উপমা সকলের লেখাতেই পাওয়া যায়।

"জল যখন তাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে; তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জল রাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে; তখনই সে ব্যর্থ হয়; স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়; তখনই সে আলোককে আবৃত করে।"

(শান্তিনিকেতন, ২৯৯)

বৈজ্ঞানিক বিচারে জল ও বাষ্পের মধ্যে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। বাষ্পই বৃষ্টি হয়ে জলে পরিণত হয়, সুতরাং বাষ্পীভবন ব্যর্থতার নিদর্শন নয়। স্ফীত অবস্থায় অর্থাৎ বাষ্প অবস্থায় জলবিন্দুর স্বচ্ছতা বিনষ্ট হয় না, আলোককে সে আবৃত করে না, করে বিকিরণ। ফলে আলোক স্তিমিত মনে হয়। এই উপমার ত্রুটি স্পষ্ট লক্ষণীয় নয়, কারণ বক্তব্য বিষয় সাহিত্যরসে ভরা। বলা বাহুল্য, যে-কোন উপমাকে, বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ক উপমা, চুলচেরা বিচার করলে কম-বেশি ত্রুটি বেরিয়ে পড়বে।

"এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল! সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষ পথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত, এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই; সমস্তই তাঁর অটল শাসনে স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে।" (শান্তিনিকেতন, ৩০৬)

নিয়মানুবর্তিতা আর শৃঙ্খলাযুক্ত কার্যকলাপের দৃষ্টান্তস্বরূপ সূর্য চন্দ্র গ্রহাদির আপাত স্থির ও অচঞ্চল অবস্থা আমাদের উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান বলে যে ঐ 'নিশ্চল অটল' জগতের মধ্যে অনুক্ষণ কী তাণ্ডব—বিক্রিয়া চলছে। পৃথিবীতে যে, প্রতি মুহূর্তে মহাজাগতিক রশ্মি পড়ছে তা কত ভাঙ্গনের পরিণতি কে জানে! কার 'অটল শাসনে' এইসব ঘটছে বিজ্ঞান সে সম্পর্কে নীরব, যদিও সীমাহীন অজ্ঞতার তীরে বসে কেউ বা কারও অদৃশ্য হস্তের কলকাঠি নাড়া সন্দেহ করছেন, কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ নেই!

"........উদ্ভিদ পশু-পাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্প পরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।" (শান্তিনিকেতন, ৩৬৫)

অল্প পরিসরে কোনো বস্তুকে যদি চেপে রাখা যায় তা হলে ফোয়ারার সৃষ্টি হয় এই তথ্য সত্য বটে। বায়বীয় ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এই তথ্যটি খাটে। কিন্তু প্রাণ, না বায়বীয়, না তরল এবং

প্রাণের গতি এখন আর 'ভাইট্যাল্ ফোর্স' বলে স্বীকৃত নয়, নির্ভর করছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর। সেখানে কোন বস্তুর চাপসৃষ্টি হয় না, শুধু রাসায়নিক তেজের আধিক্য ঘটে। এই তেজের সাহায্যে জীবন গঠনের অণুগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাণের প্রবাহ সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর বিবর্তনের যে পর্যায়ে উদ্ভিদের জন্ম হল সে একটি বিস্ময় ঘেরা পরিস্থিতি। সেটি হল প্রাণী-জগতের উৎপত্তির শুভ সূচনা। যে শ্রমসাধ্য উপায়ে গাছ মৃত্তিকা থেকে রস সংগ্রহ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাধা অতিক্রম করে, পৃথিবীর সর্বত্র শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রাণী-জগতের আবির্ভাব সম্ভব করেছে, প্রকৃতির বিজ্ঞানশালায় সে এক পরমাশ্চর্য কীর্তি। সূর্য রশ্মিকে কীভাবে আহরণ করে, সৌর শক্তিকে কীভাবে কৌশলে আবদ্ধ করে সেই বৃক্ষই মানব জাতিকে যুগ যুগ ধরে তার প্রয়োজনীয় সবকিছু জুগিয়ে আসছে, সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যই কবি অপূর্ব মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায়; মানবের দূত হয়ে তিনি এই 'মানবের বন্ধু'কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কাব্য-অর্ঘ্য দিয়ে।

"………মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যান লিপি লিখি দিলে পল্লব অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রস্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।…………
…………ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান

করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান ;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী,—সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।"

(বৃক্ষবন্দনা, ২য় খণ্ড, ৮৩৯-৪০)

আম্রবনকে উদ্দেশ করে লেখা কবিতাটিতে ঐ একই বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে ঃ

"শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর,
প্রাণরস কর তুমি পান
ওগো, আম্রবন,..............."

(আম্রবন, ২য় খণ্ড, ৮৪৫)

পৌরাণিক কাল থেকে ভারতবর্ষে নানাবিধ ভেষজ ঔষধের প্রচলন আছে। হতে পারে নামী-অনামী উদ্ভিদ পণ্ডিতদের গ্রন্থে তারা স্থান পায় নি, কোন কবিও তাদের নিয়ে ছন্দ রচনা করে নি, কিন্তু সে-সব অবজ্ঞা গায়ে না মেখে তারা মানবের উপকার করে যাচ্ছে। তেমনি একটি উপেক্ষিত উদ্ভিদ্ নিয়ে কবি যে-কবিতাটি রচনা করেছেন তাতে যেমন একদিকে পাই ঐ উপেক্ষাজনিত ক্ষোভের প্রকাশ, অন্যদিকে পাই সূর্যরশ্মির সাহায্যে উদ্ভিদ কত রাসায়নিক দ্রব্য মানবহিতার্থে প্রস্তুত করে সেই তথ্যের ইঙ্গিত।

............"সে-নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোক বীণায়
স-নামে ঝঙ্কার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়

অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ;............
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।"

(কুরচি, ২য় খণ্ড, ৮৪৭)

ভেষজ ঔষধের বইগুলিতে যে সাহিত্যে কুরচির উল্লেখ নেই একথা বলা চলে না। তবুও কবির মনে যতটা উপেক্ষা মনে হয়েছে সম্ভবতঃ ততটা নয়।

সৌরশক্তিই যে বৃক্ষের মধ্যে তেজের সঞ্চার করে এবং সঞ্চয় করে রাখে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি কবি বহু উপলক্ষেই বলেছেন। যেমন,

"হে বালক বৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়,
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ।"

(বৃক্ষরোপণ উৎসব, ২য় খণ্ড, ৮৬৬)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সঙ্গে ক্ষুদ্র মানুষের তুলনা করলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু কবির মন অন্যসুরে বাঁধা। তাঁর ধারণায় গ্রহতারার গতিপ্রকৃতি নিয়ে গাণিতিক হিসাব বিজ্ঞানের কাজ, কিন্তু তাদের সঙ্গে যদি মানুষের আত্মিক সম্পর্ক না গড়ে উঠত তা হলে এই বিশ্বসৃষ্টি অহেতুক মনে হত। এই বিষয়টি বহু প্রবন্ধে কবি প্রকাশ করেছেন। কবিতার মধ্যেও ঐ ভাবটি ধরা পড়েছে। যেমন,

"বহুলক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ্‌ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।

সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রীকোলাহল,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।"

(প্রাণ, ২য় খণ্ড, ৯৪৩)

কিম্বা,

"হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে-কথা মানবই
সে-সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য,
যেখানে তুমি আমাদেরই
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা
যেখানে তুমি ছোট, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে
তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানবপথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে—
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।"

(সঞ্চয়িতা, ৬৮৪)

এক সময়ে হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচার-প্রথাদির বিরুদ্ধ সমালোচনার শাস্ত্রীয় সদুত্তর দিতে না পেরে কিছু শাস্ত্রজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য

বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেওয়ার নিষ্ফল প্রয়াস করেন। তাঁদের অগভীর জ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণাকে উদ্দেশ করে কবির শ্লেষাত্মক রচনাটি উদ্ধৃত করা হল ঃ

“পণ্ডিতবীর মুণ্ডিতশির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম দীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থ তত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা ; ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি—
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁকে শুনিছে অবাক
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত।
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড।”

পদার্থবিদ্ গ্যামো এবং হেলম্‌হোৎস-এর বইগুলো রবীন্দ্রনাথের ভালো করে পড়া ছিল বলে বিদ্যাভূষণের বিদ্যার দৌড় তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই লিখেছেন :

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি ॥

(কল্পনা, ১ম খণ্ড, ৭৩৮-৩৯)

আধা-জ্ঞান তিনি কতখানি অপছন্দ করতেন তারই পরিচয় মেলে এই কবিতাংশ পাঠে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মে বাল্যকাল থেকে। তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ের স্থান হয়তো সামান্য তবু তা অকিঞ্চিৎকর নয়। মনে হয় যেন কাব্য সাহিত্যের পাশাপাশি চলছিল তাঁর বিজ্ঞান আহরণ ও আলোচনা। সেইজন্যেই তাঁর বিজ্ঞান চিন্তায় একটি বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সফলতা ও বিফলতা এই তার ভিত্তিমূল। তাঁর বিভিন্ন সময়ের রচনার উদ্ধৃতি থেকে এই বিষয়টি ব্যক্ত করার চেষ্টা করা যায়।

বালক মনে বিস্ময়ের ও কবি মনে আনন্দের যোগান দিয়েছিল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পশুপাখি তরুলতা ফুলফল। এদের সম্পর্কে আরো জানার জন্য তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। জানাটা জানাতেই পর্যবসিত হয় নি। জানার মধ্য দিয়ে যে-সংযোগ ঘটে তাঁর রচনায় তার প্রভাব ও প্রকাশ দেখি। ক্রমশ জীবনে চলার পথে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করার চিন্তা তাঁর মনকে নাড়া দেয়। শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট স্থান তিনি স্বীকার করেন। বিজ্ঞান ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন। এইজন্য সাধ্যমত বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ভারতের দারিদ্র্য মোচন বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত অসম্ভব এই

প্রতীতি তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা যে, ভারত যে-সত্যসাধনা আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী, জগৎসমক্ষে তাকে উপস্থিত করতে হলে বৈষয়িক ক্ষেত্রে ভারতকে সমকক্ষ হতে হবে ; বিজ্ঞান সেই উন্নয়নের একমাত্র সোপান। বিজ্ঞানকে দেশের সেবায় নিয়োজিত না করতে পারলে বিজ্ঞান-শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য-জগৎ বিজ্ঞানে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমাদের দেশের অপ্রতুল ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল তীব্র গভীর ক্ষোভ। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান কেবল বাহ্য জগতের কর্তৃত্ব নিয়েই ব্যস্ত, সেখানে মানব মনের প্রতি অবহেলা তাঁকে পীড়া দেয়। পাওয়ার লোভে বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানুষের মধ্যে হিংসা ও পশুবৃত্তি জাগ্রত করে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। মহাযুদ্ধের ধ্বংস-কার্যে বিজ্ঞানের অপব্যবহার কবির মনকে ব্যথিত করে। বিজ্ঞান যদি কেবল বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টি রাখে তার কী পরিণতি হতে পারে তা ভেবে তিনি চিন্তিত হন। এদিকে যে-বিজ্ঞান দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছিল সেখানে ধাক্কা লাগলো অনিশ্চয়তার। মানুষ বিজ্ঞানের দৌলতে ক্ষমতা পেয়ে অহংকারী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীর নিজেকে বিচার করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র বিজ্ঞান লব্ধ ক্ষমতার মাপকাঠিতে মনুষ্যত্বের বিচার করা যায় না, এই সত্যটির উপলব্ধি হলো। আর জানা গেল, তারজন্য সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা যাতে আধিভৌতিক শক্তিকে আত্মসাৎ না করে। কবি এই সতর্কবাণী নানাভাবে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

"প্রকৃতির সঙ্গে এই (আধ্যাত্মিক) যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে। যে-স্পর্শ থেকে (বিজ্ঞানী) মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে যোগাতে হবে।" (বিশ্বভারতী, ১১ম খণ্ড, ৭৬৪)

রবীন্দ্রনাথের কবির চোখে বিজ্ঞানী মানুষ—বিজ্ঞান মানব-অতিরিক্ত নয়। প্রকৃতি আর মানুষের সংযোগসেতু হয়ে কাজ করে অনুভূতি আর প্রমাণ, কল্পনা ও প্রতীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান !

(২) আলোয় ফেরা

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান চিন্তার ক্ষেত্রে আইনস্টাইন এক পরম বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ বহু। তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ লিখলেন তারা একদিকে যেমন ছিল যুগান্তকারী, অন্যদিকে সেগুলিই বিজ্ঞান চিন্তার জগতে নবদিগন্তের পথ-নির্দেশ করলো। বিশ্বসৃষ্টির অপার রহস্যের সন্ধান বিজ্ঞানসাধনের প্রধানতম লক্ষ্য। শিল্পী, দ্রষ্টা ও কবির সম্মুখে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য ও অপার সুষমা প্রতিভাত হয়—তবু তার সামগ্রিক উপলব্ধি নিরন্তর কঠিন সাধনার পথেই সম্ভব ; যে মনে ঐ সৌন্দর্য্যের ছোঁয়া লাগে, তাকে আনুষ্ঠানিক অনুশীলনের সীমার মধ্যে ধরে রাখা যায় না। হয়তো এজন্যেই, বিদ্যায়তনের নিরানন্দ-শিক্ষা পদ্ধতি আইনস্টাইনের মনে সায় পায়নি !

বিশ্বজগতে যা ঘটে তার হেতু নির্দেশ করতে নিউটনীয় চিন্তাধারা সেকালীন বিজ্ঞানীদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল। তা' সত্ত্বেও এই পদ্ধতিটির ত্রুটি ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক যে ছিল না, তা নয়,—কিন্তু সঠিক ঠিকানাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কতকগুলো প্রাথমিক স্বতঃ-সিদ্ধ থেকে বিকলন পদ্ধতিতে বিশ্ব-রহস্যের ব্যাখ্যা করাই প্রচলিত পন্থা ;—কিন্তু যদৃচ্ছ স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা করা নিরর্থক এবং অবান্তর। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন করে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। আইন-স্টাইন বিশ্বাস করতেন যে প্রাথমিক সংজ্ঞা ও প্রত্যয়গুলির সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে থাকতেই হবে এমন কোন কারণ নেই। এই প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধান্তগুলিকে জানতে হলে বহির্জগতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করলেই চলবে না,—চাই অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণার। 'তারই

ফলে যে প্রত্যয়গুলি আবির্ভাব হবে তাদেরই বাহ্য জগতের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। তা হলেই প্রত্যয়গুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে। আইনস্টাইন দেখলেন যে, প্রকৃতির নিয়মাবলী ও তার মূলসূত্র কেবলমাত্র চিন্তার পথে আবিষ্কার করা সম্ভব। নিছক চিন্তার সঙ্গে যোগ রয়েছে গণিতের সুনির্দিষ্ট রীতি ও পরিভাষার। তবুও কোন পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে গাণিতিক সমীকরণের মধ্যে ধরে রাখাকে তিনি পছন্দ করেননি, বরং ঘটনার পিছনে যে বাস্তবতা থাকে তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে চাইতেন। বিমূর্ত চিন্তাপ্রসূত ফল সুকঠিন সুসংবদ্ধ পরীক্ষার নিরিখে বিচার ও প্রমাণ না করা পর্যন্ত তিনি বিরত হতেন না। কালের পরিকল্পনা, দর্শক নিরপেক্ষ আলোকের অপরিবর্তিত গতিবেগ, বেগনির্ভর ভর-সংখ্যা, দেশবর্ণনায় ইউক্লিডীয় জ্যামিতির পরিবর্তে রিমানীয় জ্যামিতির প্রয়োজনীয়তা, দেশ-কালের সমন্বয়, মহাকর্ষের রহস্য উদ্ঘাটন ইত্যাদির সন্ধান জেনেও আইনস্টাইন বারবার সতর্ক করে বিজ্ঞান-সমাজকে জানালেন যে, সম্পূর্ণ সত্য এখনো নাগালের বাইরে। একবার তিনি বললেন, 'দেশ-কাল একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে আমরা চিন্তা করতে পারি—এটি কিন্তু আমাদের বাঁচার শর্ত নয়।' যে সত্য জীবন-মরণ ও বোধিকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে সেটিকে খোঁজার পথ থেকে সরে আসা চলবে না। তাই, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সমাধানের সন্ধানে তিনি শেষ চল্লিশ বছর একাগ্র ও তন্ময় সাধনা করেছেন; সাফল্য আসেনি বটে, কিন্তু সত্যের সন্ধানে তপস্বীর নিরলস প্রচেষ্টা সকল মানুষের কাছে, বিজ্ঞানীদের কাছে রেখে গেছে নিছক সাধনা ও বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা কীভাবে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় তার এক অবিনাশী নিদর্শন। এই তত্ত্ব নিয়ে তাঁর অমূল্য সময় ক্ষেপণ অনেকে ভাল চোখে দেখেননি। তাঁর একগুঁয়ে প্রকৃতির উল্লেখ করে নিজেই নিজেকে ঠাট্টা করে বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁকে খচ্চরের একগুঁয়েমি দিয়েছেন, আর দিয়েছেন তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি। তিনি যদি সাফল্যের

অনিশ্চয়তা ভেবে পিছিয়ে যান, তাহলে কে এসব কাজ করবে? তাঁর স্বীকৃতি আছে, তরুণ বিজ্ঞানীরা কি এই ব্যর্থতার ঝুঁকি নিতে পারে? বা তাদের একাজ করতে বলা কি যায়?—এই চিন্তা, যা পরমসত্যের দিকে বিজ্ঞানকে নিয়ে যায়, তা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে থিয়োরি সৃষ্টি এবং বহু তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার ফলেই সম্ভব। একাজ সহজ নয়, সরল নয়,—সাফল্যের আশা দূরগত। তরুণ বিজ্ঞানীরা একদিন হয়তো এগিয়ে আসবেন। তবু তাদের পথের বাধার কাঁটাগুলো দূরে সরাতে কাজে লাগাতে হবে প্রতিষ্ঠাবানদের, প্রাক্তন বিজ্ঞানীদের।

তাঁর বড় ছেলে হানস বলেছেন, 'বাবার ছিল শিল্পীর মন, তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যানুভূতি। সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ তারই নিদর্শন।' তাঁর চিন্তার শৃঙ্খলে আছে প্রথমে অনুভূতি, তারপর চিন্তা এবং সর্বশেষে কথায় প্রকাশ। দর্শনের উৎপত্তি বিস্ময়-উপলব্ধি থেকে। শিশু আইনস্টাইনের প্রথম বিস্ময় বাবার দেওয়া একটি খেলনা—কম্পাস, যেদিকে ঘোরাও কাঁটা একইদিক নির্দেশ করে। দ্বিতীয় বিস্ময়, ষোল বছর বয়সের বালকের কল্পনা, আমি যদি আলোকের বেগে মহাকাশে পাড়ি দিই তাহলে কি হবে? তৃতীয় আরেকটি বিস্ময়কর কল্পনা মহাকর্ষের প্রভাবে নামছে এমন একটি লিফটে থাকার অভিজ্ঞতা কি হবে? দশ বছর ধরে এই বিস্ময়ের ঝোঁকে চিন্তার সূত্রে মালা গেঁথে চললেন, কোন লেবরেটরি বা কোন সহকারীর সাহায্য নেই। আর তারপর একদিন তাঁর বোধিতে ধরা পড়ে একটি তত্ত্ব, আলোর গতিবেগ দর্শক নিরপেক্ষ হতে বাধ্য। আর এর ঠিক পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাঁর যুগান্তকারী প্রবন্ধটি ১৯০৫ সালে প্রকাশ করলেন।

প্রথম জীবনে তাঁর মনে দু'জনের চিন্তাধারার ছাপ ধরা পড়েছিল—এঁরা মাক ও স্পিনোজা। শিল্পকে মাক সম্বন্ধে—তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে একবার তিনি বললেন—মাকের আইডিয়ার সঙ্গে ভারতীয় উপনিষদ্ ভাবনার প্রশ্নাতীত গঠনের মিল আছে। নিরবয়ব

কথার মধ্যে দিয়ে স্বীয় প্রত্যয়ের নিরুচ্চার সংশয়হীন প্রকাশ। আর বললেন—অহংভাবের মুক্তি, ধর্ম ও দর্শনের জগতে যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, মাকের বিজ্ঞানের চিন্তায় আছে সেই মুক্ত চিন্তা; মাক ছিলেন বুদ্ধের ভক্ত—বাস্তবক্ষেত্রে এই পরম কারুণিকের তত্ত্ব ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিরবোধে মানবজাতিকে নিয়ে যায়, পথ দেখায় সংশয় সংকট ভরা জগতের দুঃখবোধ থেকে পরমপ্রাপ্তি নির্বাণের পথে। মাকের ছিল যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা, একটি সংস্কারমুক্ত মন। আর স্পিনোজার কথা বলতে গিয়ে জানালেন, একটি অতিমানসের চিন্তা যা এই অভিজ্ঞতার জগৎটিকে প্রকাশ করতে পারবে সেই আমার ঈশ্বর-ভাবনা। সহজ কথায় একে বলতে পারি স্পিনোজার Pantheistic বা সর্বেশ্বর মতবাদ। তাঁর কাছে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টি অভিন্ন। সুতরাং এজগৎ মায়া নয়, মিথ্যা নয়।

মানসিক গঠনের কাঠামোয় আছে মাক ও স্পিনোজা। অথচ বিজ্ঞানের আলোচনার কালে তাঁর অভিন্নতাবোধ অনুভূতি-গ্রাহ্য প্রমাণ-অতীত যুক্তি-পরম্পরায় গড়ে তোলে একটি সত্য, যাকে অভিজ্ঞতার জগতের নিরিখে বিচার করা যাবে, প্রমাণ করা যাবে। মাক-এর নিউটনীয় চিন্তাধারার সমালোচনার তারিফ তিনি করতেন। মনে করতেন এই পদ্ধতিটি যুক্তিসহ। কিন্তু মাকের মত তিনি বিশ্বাস করতেন না যে, পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলি বা নিয়মাবলী কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তাঁর মতে, বিশ্বের রহস্য উন্মোচনের পথে মানুষের মনন ও চিন্তার অবদান অনেকখানি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভিন্নতা চেতনার রঙে স্বরূপ খুঁজে পায়। চেতনার প্রকাশ ভাষায় এবং তার প্রমাণ এই জগতের কাঠামোতে।

বিজ্ঞানের গবেষণায় সহকর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করার রীতি আছে। বিশদ গণনার কার্যে শেষেরদিকে সহকর্মীদের সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন; কিন্তু প্রথমদিকে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা সবই তাঁর একক প্রচেষ্টা। তাঁর অসাধারণ আত্ম-প্রত্যয় ও স্বনির্ভরতাই ছিল

তাঁর একমাত্র সঙ্গী। বহির্জগতের আড়ালে থেকে তিনি তাঁর যুগান্ত-কারী কাজ বিশেষ-আপেক্ষিকতাবাদ গঠন করলেন। এই প্রবন্ধটি বুঝতে গণিত কিংবা পদার্থবিদ্যার কোন বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; এমন কি একটি রেফারেন্সও ছিল না, যা সচরাচর থাকে। অথচ পরিণত চিন্তাশক্তির পরিচয় প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে। তাঁর চিন্তার অনুক্রমটির তুলনা বুঝি পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে —যেখানে একেকটি প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে যাজ্ঞবল্ক্য সত্যের সোপান আরোহণ করছেন—যেখানে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে উঁকি মারে অনেক প্রশ্ন। আইনস্টাইনীয় চিন্তাধারায় সেই প্রশ্ন-উত্তরের অনন্ত প্রবাহ। তবে এখানে নেই যাজ্ঞবল্ক্যের গার্গীকে ভর্ৎসনা—অতিপ্রশ্ন করো না। বিজ্ঞানের চিন্তায় অতিপ্রশ্ন নেই। জিজ্ঞাসার সীমারেখা নেই।

এই কারণেই কালের পরমতত্ত্বের ধারণা ধূলিসাৎ করে পদার্থবিদ্যার নূতন দিগন্ত উৎসারিত করা আইনস্টাইনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। দেশ-কাল ও গতি সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণায় বিপ্লব ঘটাতে পারলেন। তবু তিনি সন্তুষ্ট নন; কারণ বিশেষ-আপেক্ষিকতাবাদে একটি সীমাবদ্ধতা আছে। সব গতি সম ও সরলরৈখিক। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় পাওয়া অধিকাংশ গতি অসম ও ঘূর্ণ্যমান। নিউটনীয় চিন্তায় ঘূর্ণনগতি পরম, অথচ তাঁর মতে সব গতি আপেক্ষিক। এই বিষয়ে মাকের চিন্তা আইনস্টাইনের ভাবনাকে পরিচালিত করে। দূরের নক্ষত্র কিভাবে পৃথিবীর বস্তুকে প্রভাবিত করে অর্থাৎ ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্ররাজি কিভাবে পৃথিবীর উপর কেন্দ্রাতিগ বল প্রয়োগ করে? কেন্দ্রাতিগ বল এবং মহাকর্ষ বল উভয়ে কেবল ভরের সঙ্গে সম্পর্কিত —সুতরাং তারা এক; আইনস্টাইন বললেন, ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্ররাজির মহাকর্ষ বলই কেন্দ্রাতিগ বলরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। কী অসাধারণ ও অব্যর্থ গভীর চিন্তা; তাঁর এই সাধারণ-আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে মহাজাগতিক সম্পর্কটির বিচার করে তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের গঠন ও ইতিবৃত্ত রচনা করলেন।

ইনফেল্ড ও হোফমানের সঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধে তিনি দেখান যে, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কেবলমাত্র মহাকর্ষতত্ত্বই প্রকাশ করে না—এতে কণার গতিও প্রকাশ পায়। নিউটন গতি-সূত্র এবং মহাকর্ষ—দুটি পৃথক চিন্তা। এদের তিনি আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে গড়া একটি সমীকরণে প্রকাশ করতে পারলেন। কারণ তিনি স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী।

ফিলড্-এর ধারণাকে আইনস্টাইন অনেক গভীরে নিয়ে গেলেন। ফিলডের বৈশিষ্ট্য থেকে বস্তুর বৈশিষ্ট্য বা গুণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কণা হলো ফিলডের ঘণীভূত প্রকাশ যেন! দুটি ফিলড্ সমীকরণ, যথা বিদ্যুৎ-চুম্বক-তত্ত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ,—এই দুটিকে মিলিয়ে-মিশিয়ে একটি সুপার ফিলড্ কি হতে পারে—যার ভিত্তিতে সমগ্র ভৌত অস্তিত্ব প্রকাশিত হতে পারে? এটি অতি প্রশ্ন নয়। এটি তাঁর চিন্তার রাজ্যের আধাফোটা পদ্মকলি। সাধারণ-আপেক্ষিকতাবাদ গঠনকালে তাঁর মনে মহাকর্ষের ফলে লিফটের ধারণাটি ভেসে ওঠে—তত্ত্বগঠন সহজ হয়। একীভূতক্ষেত্রতত্ত্ব চিন্তারকালে অনুরূপ কোন অভিজ্ঞতা বা প্রেরণা তিনি পাননি। তবে অলোচনাকালে তিনি যে ভাবসমুদ্রে ডুব দিতেন তার বিবরণ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সহকর্মীদের লেখায় পাওয়া যায়।

ইনফেল্ড ও হোফমানের সঙ্গে কাজ করতে করতে যখন সমাধান আর হচ্ছে না, তখন আলোচনা থামিয়ে তিনি বললেন "I will a little tink; তারপর উঠে হাঁটতে হাঁটতে চুলের মধ্যে আঙুল ঘুরিয়ে চক্রাকারে চলতে লাগলেন। সহকর্মী দুজন নীরব, নিশ্চল। কিছু পরে তাঁর মুখে অন্তর্মুখী ভাব ফুটে ওঠে, দৃষ্টি দূরগত, স্বপ্নালু, পরিচিতির বন্ধনভাঙ্গা; অতিগভীর চিন্তার ভাব তাঁর চোখে মুখে। হঠাৎ যেন দৃশ্যত দেহ কিঞ্চিৎ শিথিল হলো, মুখে একটুখানি হাসি, চোখ আলোয় উদ্ভাসিত। আর ঘুরছেন না, চুলও টানছেন না, যেন পুরনো পরিবেশে ফিরে এসেছেন। আরেকবার সহকর্মীদের দেখতে

পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন সমাধানটি। কত সহজ সেই সমাধান—সহকর্মীরা ভাবেন, কেন তাঁরা খুঁজে পেলেন না উত্তর !

ফিলিপ ফ্রাঙ্ককে একদা তিনি বলেছিলেন, 'যে কাজ আমি করি সে তো যে কোন জায়গায় করা যায় ! আমার সমস্যার সমাধান চিন্তায় পটসডাম ব্রিজ বা বাড়ীর আরাম কোন ব্যাপারই নয়।' আর অন্য আরেকবার বললেন, 'চরমতম অভিজ্ঞতা আমরা পাই রহস্যের রোমাঞ্চনায়। সার্থক শিল্প ও সার্থক বিজ্ঞানচেতনার ভিত্তিতে রয়েছে এরই মৌলিক অনুভূতিটুকু। যে এটি জানে না, এতে বিস্ময় মানে না, অভিভূত হতে পারে না সে তো মৃত। তার চোখ দৃশ্যত অন্ধ।' সার্থক জ্ঞানের পারাবারে তাঁর বিচরণ সেখানে তাঁর সাথী তাঁর বোধি, তাঁর মনন, তাঁর চেতনা। আরেকবার তিনি বললেন, 'যদি আমরা অধিকাংশই ছেঁড়া পোশাক আর ভাঙা আসবাব-পত্রের জন্য লজ্জা পাই তবে সঙ্কীর্ণ আইডিয়া বা পঙ্গু দর্শন-চিন্তার জন্য আমাদের আরো লজ্জিত হওয়া উচিত।' নিজে তিনি অগোছাল পোশাক পরে অতি সামান্য আসবাবপত্র নিয়ে কাজ করেছেন—তাঁর চিন্তাতে কিন্তু বিশৃঙ্খলা নেই। নেই উপলব্ধি-দর্শনে পঙ্গুতা।

ফিলিপ ফ্রাঙ্ককে আরেকবার বললেন, 'ধর্মের পরিমিতিতে আছে একটি বিন্যাস—অস্তিত্বময় জগতে যে নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠিত তারা যুক্তিসহ ; অন্তত যুক্তি দিয়ে এদের বোঝা যায়। এই বিশ্বাস নেই এমন কোন একজন খাঁটি বিজ্ঞানীর কথা আমি ভাবতে পারি না। এই বোধটিকে একটি প্রতীকে বোঝান যেতে পারে—ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান যদি হয় পঙ্গু তবে বিজ্ঞান চেতনাহীন ধর্ম—সে অন্ধ।' তাঁর এই বিশ্বাসের ফলে পুরনো ভঙ্গুর মানব মূল্যবোধগুলি নতুন সাজে সেজে দাঁড়ায়। আর তাঁর একমাত্র বাসনা—পরম সত্যটিকে জানতে। কোন প্রলোভন, কোন বাধা তাঁকে এই খোঁজা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। উপনিষদের বালক নচিকেতার মত মৃত্যুর কাছে তিনি একটি প্রার্থনা রেখেছিলেন, একটি বর চেয়েছিলেন, পরমসত্যকে

জানতে দাও। নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে—এছাড়া নচিকেতার কোন প্রার্থনা নেই। আইনস্টাইনেরও ছিল না। পার্থিব সম্পদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি, এইসব বহির্বিশ্বের কামনা-বাসনা তাঁর জীবনের তীব্র অনুভূতির চাপে স্তিমিত হয়ে থাকে। মনঃসংযোগ ও সংযমের কঠিনতায় গড়ে ওঠা নৈর্ব্যক্তিক ভাব জিজ্ঞাসার প্রশ্নচিহ্নের সামনে শিশু ভোলানাথের মধুর বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে তাঁকে মনে হয়েছে নিরাসক্ত। এই আসক্তিহীনতা তাঁকে শুষ্ক সন্ন্যাসী হতে দেয়নি : কারণ তাঁর মনের গঠন, তাঁর সৌন্দর্যপিপাসা। উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে, তিনি আনন্দ, তিনি সরস, তিনি কবি। তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞানের সত্যের সন্ধানে তিনি সৌন্দর্যরসিক ; কারণ সত্য শুধু অদ্বৈত নয়, তাঁর সত্য মঙ্গলময় শিব, সে সুন্দর। কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাকালে সেই সর্বব্যাপী এবং মঙ্গলময় সুন্দর-সুকুমার সত্যের কথা বললেন। এই কারণে তিনি মানবতাবাদী, শান্তিবাদী। এখানেও তিনি সৌন্দর্যপিয়াসী।

হিটলারের অভ্যুত্থানে মানব মূল্যবোধের ধ্বংসের সূচনা দেখলেন। আবার মহাযুদ্ধের কালে এবং পরে দেখা গেল চিরায়ত, লোকায়ত মানব মূল্যবোধের অবক্ষয়, এরজন্য দায়ী বিজ্ঞানের প্রয়োগবিদ্যা, প্রচলিত ধারণাকে বিজ্ঞানের ভেঙ্গে ফেলা—এই তাঁর বিশ্বাস। লোকায়ত বিশ্বাসকে প্রচলিত ধর্ম লোকোত্তরে উত্তীর্ণ করতে পারছে না—কেননা সেখানে নেই মহান চিন্তার মুখরতা, সমানত্বের সাধনা।

চিন্তার এই দিশেহারা কালে ১৯৩৪ সালে তিনি বললেন, 'অহং-বোধের মুক্তির চেতনা ও পরিমাণের উপর মুখ্যত মানব মূল্যায়ণ স্থির হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে সব সম্পদ-উৎসর্গিত-প্রাণ কর্মীদের হাতে এলেও মানবজাতির অগ্রগতি ঘটে না। একমাত্র বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র মহাপুরুষরা আমাদের সৎচিন্তা ও সৎকর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে। অর্থ শুধু স্বার্থসিদ্ধির উপায়, শুধু দুর্দম অপব্যবহারের পথ দেখায়। মুশা, যিশু অথবা গান্ধী যে কার্নেগীর টাকার থলি নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন একথা কি কল্পনা করা যায়?' তাঁর চিন্তার আড়ালে আছে মৈত্রেয়ীর উক্তি—'যাতে আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কি করব?' আর আছে মহাভারতীয় ঘোষণা—মহাজনদের পথই পথ। এই মহাজনরা নিঃস্বার্থপর, চিন্তাবিদ্, যুক্তিবান ; এঁরা স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট ; এঁরা সত্যদ্রষ্টা অথবা সত্যান্বেষী। বিজ্ঞানের মত সত্যের পথযাত্রীরা সেই মহতো মহীয়ান পথের সূচনার ইঙ্গিত জানাতে পারে। এঁরাই সত্যকাম-ব্রাহ্মণ। এদের হাতে উপনিষদের নব ব্যাখ্যা গড়ে উঠবে, মানবজাতির নবমূল্যায়ণ স্থিরীকৃত হবে। বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব অনেক, এই তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রত্যয়। কারণ বিজ্ঞানই ধর্মের পরিপূরক যা মানব সমাজকে ধারণ করে—তার সহযোগী।

অতীত ভারতের চিন্তাজগতে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পাশ্চাত্যের কঠিন যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভাবে আমরা সেই ঐতিহ্য ভুলে গেছি। আমাদের মূল্যবোধ আজ অন্যধরনের। বিজ্ঞানের যে দিকটি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় সেখানে নেই আইনস্টাইনের উপনিষদের মর্মবাণীর সিক্তধারা। এটি না জানলে বোধহয় চিরকালের জন্য আমরা ঘানিকলেই ঘুরব।

সমুদ্র

আমাদের মনে সমুদ্র একাধিক ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু সমুদ্রবর্ণনায় প্রধানতঃ ছ'টি দিক দেখতে পাই। একটি সমাহিত ও সৌন্দর্যময় মূর্তি, অন্যটি সংহার ও ভয়াল রূপ।

এখানে প্রধান দায়িত্ব হল সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন ও আলোচনা করা।

চারশো থেকে পাঁচশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। জন্মকালে পৃথিবী একটি তরল অগ্নিকুণ্ড ছিল—বলা যেতে পারে। নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ক্রমশ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ঠাণ্ডা হতে থাকে। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশে এখনও উত্তপ্ত তরল পদার্থ রয়েছে। তাপমাত্রা কমবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিক্রিয়া ঘটে সিলিকেট জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদির মধ্যে; ফলে জল নিষ্কাশিত হয় এবং অবশ্যই হয় বাষ্পাকারে। ক্রমশ সেই বাষ্প বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নামে আর ঢালু জায়গাগুলি ভরতে থাবে। এইভাবেই সমুদ্রের সৃষ্টি। বৃষ্টির জলে দ্রবণীয় লবণ বছরের পর বছর ধরে জমতে থাকে। সূর্যকিরণে জল বাষ্পাকারে উর্ধ্বে উঠে মেঘে পরিণত হয়, তারপর বৃষ্টিতে। সেই বৃষ্টি পৃথিবীর লবণ ধুয়ে নিয়ে আসে। এমনি করে লবণের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

সমুদ্রের উৎপত্তি হল বটে, কিন্তু তখনও পৃথিবীতে প্রাণবস্তুর চিহ্নমাত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রাণধারণের পক্ষে নানাদিক থেকে পৃথিবীর পরিবেশ তখনও উপযুক্ত হয়নি। তবু লবণাক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম প্রাণের স্পন্দন সমুদ্রজলেই সম্ভব হয়েছিল। সে এক বিস্ময়কর

ঘটনা। ঘটেছিল তুশো কোটি বছর আগে। তারও অনেক পরে—প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর বাদে পৃথিবীর ডাঙায় হল প্রাণের আবির্ভাব।

সমুদ্র আর পৃথিবীর প্রাণবস্তুর মধ্যে পার্থক্য অনেক। পৃথিবীর প্রাণীর পক্ষে জল অত্যাবশ্যক হলেও জলের মধ্যে বসবাস করতে পারে না—তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য উন্মুক্ত বাতাস চাই, চাই পর্যাপ্ত অক্সিজেন। জলে তার খুবই অভাব। জলের প্রাণী ডাঙায় উঠলে প্রাণ টেঁকেনা, অত অক্সিজেন তার পক্ষে অসহ্য। এইজন্যই মানুষ সমুদ্র কিম্বা গভীর জল দেখলেই ভয় পায়। তেমনি ভয় সামুদ্রিক প্রাণীর ডাঙায় চড়তে।

পৃথিবীর সাত ভাগের পাঁচভাগই জল, কিন্তু ডাঙার প্রাণীদের জলের প্রয়োজন অতি সামান্য (০'৬%). সে-জলও আবার লবণাক্ত হলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন ঃ 'যে-জল মানুষেব বন্ধু সেই জল ডাঙ্গার মাঝখান দিয়াই বহে। সে-নদীগুলি ডাঙ্গাব ভগিনীদের মতো। তাহারা কতদূরের পাথরবাঁধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল লইয়া আসে; তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ! তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ!···সে যমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলই শিঙ্ তুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হঠাইতে পারিল না।' (পথের সঞ্চয়, জলস্থল)

মানুষ যুগে যুগে বিরাট পর্বতমালা বিস্তৃত বনরাজি ও অতল জলরাশির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। মানুষ তাদের মধ্যে দেখতে পেয়েছে দেবত্ব; এবং আরাধনা করেছে বিরাটের। বিরাটের সম্মুখীন হলে মানুষ তার নগণ্যতা উপলব্ধি করে এবং এই নম্রতাকে আশ্রয় করেই মানুষের মন উদারভাবে পরিপূর্ণ হয়।

কবির কথায় ঃ

"হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী

... ...

বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্রহাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়।
সবারে আনিতে বুকে বুক ফেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া॥"

(সিন্ধুতীর, কড়ি ও কোমল)

অথবা :

যাকনা মুছে তটের রেখা
নাই-বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে
লওরে বুকে দু'হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

(সমুদ্র, খেয়া)

সমুদ্রের ভয়াল দিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা যারই হয়েছে সে জানে উত্তাল সমুদ্রের কবল থেকে রেহাই নেই। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সমুদ্রের প্রলয়মূর্তি কীভাবে প্রকট হয়েছে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

"হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে ক্রন্দনে
রোষে-ত্রাসে ঊর্ধ্বশ্বাসে অট্টরোলে অট্টহাসে
উন্মাদ গর্জনে
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে যায় টুটে
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে আপনার কূল।"

(সিন্ধুতরঙ্গ)

কিংবা,

············জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল
মসৃণ চিকণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসমক্রুর
খলখল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ ফণা
খুঁজিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
·········চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষলক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। একদিকে যায় দেখা
অতি দূর তীরপ্রান্তে নীল বন রেখা—
অন্যদিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারি রাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধত বিদ্রোহ ভরে।

(দেবতার গ্রাস, কাহিনী)

অথবা :

যুগ যুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জন
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।

(সমুদ্র, কড়ি ও কোমল)

জাভা যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মানুষ চির বিদ্রোহী। সমুদ্রের দিগন্ত প্রসারিত বিরাট নিষেধ দেখে সে থামলো না, বললে, 'আমি নিষেধ মানবোনা।' বজ্র গর্জনে জবাব এলো ; 'না মান তো মরবে।' মানুষ তার এতটুকু বৃদ্ধাঙ্গুলি

তুলে বললো, 'মরি ত মরব'। সাড়ে তিন হাত মানুষ স্পর্ধা করে বললে, 'ঐ সমুদ্রের পিঠে চড়ব।'

(জাভাযাত্রীর পত্র-৩)

মানুষের সমুদ্রের পিঠে চড়ার ইতিহাসে কত রোমাঞ্চকর ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে অনেক ব্যর্থতার কাহিনীও আছে। মানুষ কেবল পিঠেই চড়েনি, সমুদ্রের তলদেশেও ভ্রমণ করেছে, অবাধে না হলেও নিঃশঙ্কচিত্তে ত' বটেই। সব মিলিয়ে আজ একটি বিজ্ঞান বিষয় রচিত হয়েছে যাকে বলা হয় সমুদ্র বিজ্ঞান, ওসিয়ানোগ্রাফী। বহু বিজ্ঞানী, নাবিক এবং দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীরা তাঁদের জীবন তুচ্ছ করে কত যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু অতল সমুদ্রের তল পাওয়া গেছে কি? মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা যে-সব যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়েছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এখনও অনেক অজানা রয়েছে। যা জানা গেছে তার তাৎপর্যও এখন পর্যন্ত ঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায় নি।

উৎপত্তি

সমুদ্রের উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায় নি। কবে এবং কী-ভাবে সমুদ্রের আবির্ভাব হল তার কোন চাক্ষুষ বিবরণ থাকা সম্ভবপর নয়, কারণ সমুদ্রের উৎপত্তিকালে কোন প্রাণীই জন্মায়নি। মানুষ ত অনেক অনেক পরে এসেছে। সুতরাং, পরোক্ষ তথ্যের উপর, অনুমানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এইসব তথ্যের উৎস হল চন্দ্র সূর্য ও তারকামণ্ডল। প্রায় ৫০০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী যখন প্রথম সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরছিল, তখন পৃথিবীর চেহারা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। তার একটু ইঙ্গিত গোড়াতেই দিয়েছি। উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থে পরিণত পৃথিবী তীব্র বেগে প্রচণ্ড মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ঘুরতে লাগলো। ক্রমশ বায়বীয় পদার্থ তরলিত হলো এবং ঘূর্ণনের ফলে কেন্দ্রে জড়ো হল লৌহাদি ভারী-ভারী পদার্থগুলি এবং হালকা হতে যুহতে পৃষ্ঠ দেশে জমা হল সিলিকনক্ত যৌগগুলি। কেন্দ্রে তাপমাত্রা

দু'শো কোটি বছর আগের মতই আছে, কিন্তু সেখানে চাপও প্রচণ্ড ; তারই ফলে কিছু তরল অংশ কেন্দ্রে কঠিন পদার্থে পরিণত হল। তার ঠিক পরবর্তী স্তরটি ভারী কিন্তু তরল রয়ে গেল। তার পরের স্তরগুলি ক্রমান্বয়ে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত কঠিন ও হালকা। যে-সব শিলাবস্তু এই স্তরগুলিতে বিদ্যমান তার মধ্যেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। নিচের দিকে অপেক্ষাকৃত ভারী বেসাল্ট্‌ এবং তার উপরের স্তরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত হালকা গ্র্যানাইট।

যখন তরল থেকে কঠিন অবস্থায় পরিণত হচ্ছিল তখন পৃথিবীতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে বলে আন্দাজ করা হয়। পৃথিবীর তরল পদার্থে লাগলো সূর্যের আকর্ষণজনিত জোয়ারের টান—সে টান এত জোরালো ছিল যে পৃথিবীর একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তি তাকে ধরে রাখতে পারলো না। এই বিচ্ছিন্ন অংশই হল চন্দ্র—সে-ও ঘুরতে লাগলো সূর্য ও পৃথিবীর আকর্ষণ বলে—আপন অক্ষরেক্ষার উপর এবং প্রদক্ষিণ করতে লাগলো পৃথিবীকে।

সমুদ্রতল একেবারেই সমতল নয়। উঁচু-নিচু বহু পর্বতশ্রেণীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের জল যদি সরিয়ে নেওয়া যেত তা হলে পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি সুগভীর গহ্বর চোখে পড়ত। আর দেখা যেতো যে, তলদেশ বেসাল্ট্‌ শিলা দিয়ে তৈরী। গ্র্যানাইটের কোন চিহ্নই নেই, অথচ অন্যান্য সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে গ্র্যানাইট। অতএব অনুমান করা হয়, প্রশান্ত-মহাসাগর যেখানে তৈরী হয়েছে, সেখান থেকেই পৃথিবীর তরল অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্রে পরিণত হয়েছে। চন্দ্রকে যখন সমুদ্রের জলে প্রতিবিম্বিত দেখি তখন কি মনে হয় যে, সমুদ্রতলে পৃথিবীর কোলে যে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তারজন্য চন্দ্রই দায়ী? চন্দ্রের গড় ঘনাঙ্ক (৩·৩) পৃথিবীর গড় ঘনাঙ্ক (৫·৫) থেকে অনেক কম। অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশ ভারী, সূর্যের জোয়ারের টানে সে অংশ বিচ্ছিন্ন হয় নি, অপেক্ষাকৃত উপরিভাগ থেকেই যে পর্যন্ত তরল বেসাল্ট্‌ শিলা ছিল—বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

চন্দ্রের জন্ম ও প্রশান্ত মহাসাগরীর গভীর গহ্বরের উৎপত্তি পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সার্বিক ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে সৃষ্টি হল অন্য মহাসাগরগুলির। চন্দ্রের অনেক পরে সমুদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। শিলা থেকে বিচ্যুত জল তখনও বাষ্পাকারে অথবা মেঘের আকারে ভেসে ছিল, তারজন্য সূর্যরশ্মির খরতাপ পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারত না। তাপ বিমোচনের সাধারণ নিয়মানুসারেই পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকে। তারপর আরম্ভ হলো বৃষ্টি। ক্রমশঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থিত লবণ ধুয়ে এসে সমুদ্রের জলে মিশল। এমনিভাবেই সমুদ্রের লবণাক্ত জলের উৎপত্তি হল এবং এখনও এই পদ্ধতিতে লবণাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমশঃ আমরা জলভাগ থেকে স্থলভাগ বিভিন্ন করে দেখতে শিখেছি। ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল প্রায় ৫১ কোটি ২২ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এর সাত ভাগের পাঁচ ভাগই জল, মাত্র দুই ভাগ স্থল। স্থলজ ও জলজ প্রাণীর মধ্যে বিভেদও প্রচুর।

পৃথিবীর জন্মের সময় কোনপ্রকার জৈব পদার্থ বিদ্যমান ছিল না, সবটাই ছিল অজৈব। কী ভাবে এই অজৈব পদার্থ জৈবপদার্থে রূপান্তরিত হল তার কারণ এখনও রহস্যঘেরা। ক্রমশঃ নাতিশীতোষ্ণ ক্ষীণ সূর্যালোকসিঞ্চিত জলের তাপে লবণ ও লবণত্ব এমন একটি অবস্থায় হাজির হল যাতে প্রোটোপ্লাজম্ নামে একটি বিস্ময়কর পদার্থের সৃষ্টি হল। এটি এখন পর্যন্ত কোন গবেষণাগারে প্রস্তুত করা যায় নি। প্রত্যেক জীবকোষে এই প্রোটোপ্লাজম থাকবেই। কিন্তু কোন জড়-বস্তুতে থাকে না। খাদ্যবস্তু থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আত্তীকরণ পন্থায় কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম্-এ প্রবেশ করে এবং প্রাণীকে বাড়তে সাহায্য করে। প্রাণীর পক্ষে অপরিহার্য প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর মত একটি সুসংগঠিত পদার্থ তৈরী হতে কত কোটি বছর লেগেছে, প্রকৃতিকে কত যে ভুলচুক, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ছোট ছোট অণুর সহযোগে জটিল অণুর সৃষ্টি রহস্য আজও অজ্ঞান-অন্ধকারে ঢাকা। এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম থেকে অ্যামিবা,

প্রোটোজোয়া প্রভৃতি এককোষী জলজজীব এসেছে ; এককোষী থেকে বহুকোষী এবং তা থেকে ক্রমশঃ মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের উৎপত্তি হল।

পৃথিবী তখনও ঘন মেঘে ঢাকা থাকতো, সূর্যের যে ক্ষীণ আলো সমুদ্রের জলে পড়ত, তাতে সবুজ ক্লোরোফিল তৈরীর সম্ভাবনা কমই ছিল। মেঘাবরণ পাতলা হতেই সূর্যকিরণ তীব্রতর হল এবং কোন কোন প্রাণী সমুদ্রের উপরিভাগে এসে অল্প-অল্প ক্লোরোফিল তৈরীর কাজে লেগে গেল। ক্লোরোফিল-এর উপস্থিতিতে ও সূর্যের আলোর সহায়তায় কার্বন-ডায়ক্সাইড্ ও জলের সঙ্গে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফলশ্রুতি নানারকমের জৈবপদার্থের সৃষ্টি যা প্রাণীজগতের পুষ্টির কাজে দরকার হয়। এমনি করে প্রথম উদ্ভিদের সৃষ্টি হল সমুদ্রে। সমুদ্রে এমন সব প্রাণী আছে, যাদের ক্লোরোফিল নেই কিন্তু তারা উদ্ভিদ খেয়ে দেহের পুষ্টিসাধন করতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, সমুদ্রের এই প্রাথমিক শিক্ষা জলজপ্রাণীর মধ্যে এখনও কাজ করছে।

শত-সহস্র-কোটি বছর ধরে প্রাণীজগতে ক্রমশঃ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—এককোষী থেকে বহুকোষী প্রাণী। বহুকোষী প্রাণীর মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া প্রজনন ইত্যাদির জন্য বিশেষ বিশেষ অঙ্গের আবির্ভাব হল। সমুদ্রের ধারে ধারে পার্বতীয় তলদেশে স্পঞ্জ ও প্রবাল প্রাণীরা বাসা বাঁধল। জেলিমাছ ভেসে বেড়াতে লাগল এবং এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ল। কতরকম মৎস্যজাতীয় প্রাণী ক্রমশঃ সমুদ্রের জলে উৎপন্ন হতে থাকল। কোথাও দেখা গেল শেওলাজাতীয় অণুবীক্ষণীয় উদ্ভিদ থেকে জন্ম হল জটিল ও বৃহদাকার সামুদ্রিক গাছপালার। এরা সবাই ভাসমান জলের স্রোতে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তখন পর্যন্ত মহাদেশে অর্থাৎ স্থলভাগে কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। সমুদ্রোদ্ভূত প্রাণীদের মধ্যে কোন প্রচেষ্টাই ছিল না যে তারা স্থলভাগ আশ্রয় করে, কারণ তখনও স্থলভাগ মরুভূমির মত ঊষর ; মৃত্তিকার

চিহ্নমাত্র নেই ; প্রাণধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকল—প্রথমে ভূ-পৃষ্ঠ, তারপর গভীর তলভাগ। তাপ বিমোচনের হার স্তরে স্তরে বিভিন্ন হওয়ার দরুণ জায়গায় জায়গায় সংকোচন হল, কোথাও উত্তাল হল। এমনি করে জন্ম হল পর্বতমালার। এরকম পর্বতমালার উৎপত্তি অন্ততঃ তিনবার ঘটেছিল। প্রথম দু'বারের ঘটনা এত অতীতের যে, তার কোন চিহ্নই আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৃতীয় বারের ঘটনা প্রায় একশো কোটি বছর আগেকার। পূর্ব ক্যানাডার লরেন্সিয়ান পর্বতমালা এবং হাড্‌সন বে'-র চারিদিকে গ্র্যানাইটের প্রাচীর এখনও সেই ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এই প্রকারে উদ্ভূত পাহাড়-পর্বতের একটি বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। জলবায়ুর প্রভাবে পর্বতস্থিত শিলা মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়। ঐ মৃত্তিকাকে আশ্রয় করেই উদ্ভিদ প্রাণরক্ষা করে। কিন্তু দেখা যায় যে, পঞ্চাশ কোটি বছর পূর্বেও পৃথিবীপৃষ্ঠ কোনরকম প্রাণীর বেঁচে থাকার মত পরিবেশ তৈরী করতে পারে নি। সমুদ্রে নানাপ্রকার প্রাণীর জন্ম হতে লাগল এবং কখনও ভূমিকম্পের সময়, কখনও আগ্নেয়গিরির আবির্ভাবের সময় পর্বতমালা ওঠা-নামা করেছে, বরফের পাহাড় এক-প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে চলে গেছে। প্রাণীসঙ্কুল সমুদ্রের জল মহাদেশের স্থলভাগ আক্রমণ করেছে কিন্তু আবার সমুদ্রে ফিরে গেছে, কোন প্রাণীই স্থলভাগে টিকতে পারে নি।

প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগের ঘটনা। অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে শুধু একটি দুঃসাহসের পরিচয় দিল। সমুদ্রতীর সন্নিকট স্থলভাগে উপনিবেশ স্থাপনে সেই হল পথিকৃৎ। এটি হল একটি আর্থ্‌রোপড্‌—যার ভবিষ্যৎ বংশধর হল চিংড়ি, কাঁকড়া এবং পোকামাকড়। সেটি পুরোপুরি স্থলভাগকে আশ্রয় করল না, সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক-ছিন্ন করল না। এখন যে কাঁকড়া সমুদ্র তীরে দেখতে পাই তার সঙ্গে ঐ আর্থ্‌রোপড্‌ তুলনীয়। আর্থ্‌রোপড্‌-এর পরেই

হল মৎস্যজাতীয় প্রাণী, যারা অল্পজলে এবং কাদামাটিতে প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারল।

কিন্তু কেবল সমুদ্রের প্রাণীর দ্বারাই স্থলভাগে সকল প্রাণীর পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হত না। গাছপালার বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে কার্বন-ডায়ক্সাইড-এর পরিমাণ কমতে থাকল এবং অক্সিজেন-এর পরিমাণ লাগল বাড়তে। এই পরিপূরক ব্যবস্থায় প্রাণীজগতের আবির্ভাব সম্ভব হল। অগভীর সমুদ্রের জলকে আশ্রয় করে পৃথিবীতে নানাপ্রকার প্রাণীর উৎপত্তি হতে আরম্ভ করল। কোটি কোটি বছর ধরে এমনি করে সমুদ্রের জলে ও পৃথিবীর স্থলভাগে কত-যে প্রাণীর আবির্ভাব হল আর কত-যে অবলুপ্ত হল তার ইয়ত্তা নেই। স্থলভাগের প্রাণীর সঙ্গে সমুদ্রের প্রাণীর সম্পর্ক যে নিবিড় এবং সমুদ্রের জল-ই যে প্রাণের আদিম আশ্রয় তার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পৃথিবীর স্থলভাগের যে-কোন প্রাণীই হোক না কেন, তার প্রত্যেকটির ধমনীতে যে-লবণাক্ত পদার্থটি প্রবাহিত হচ্ছে, তার সোডিয়ম, পটাসিয়ম ও ক্যাল্‌সিয়ম-এর আনুপাতিক পরিমাণ সমুদ্র জলের প্রায় সমান। সকল প্রাণীর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে একটিই সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। প্রতিটি প্রাণীর জীবকোষে প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর রাসায়নিক সংযুতিও প্রায় একই রয়ে গেছে; যদিও শরীর গঠন ও বৃত্তি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণী প্রায় পাঁচ কোটি বছর স্থলবাসের পর সমুদ্রে ফিরে যায়। তার মধ্যে সরীসৃপজাতীয় প্রাণীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের অবয়ব প্রকাণ্ড এবং স্থলে চলাচল অসুবিধা-জনক ছিল। প্রায় কয়েক লক্ষ বৎসর আগে তাড়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে আরও কিছু স্থলবাসী প্রাণী সমুদ্রবাসের সংকল্প নেয়। তাদের বংশধর হল আমাদের জানা আজকের সীল ও সীলজাতীয় বৃহদাকার জল-সিংহ, জলহস্তী এবং তিমি। একই কারণে হয়তো বা সমুদ্রের প্রতি মানুষের আকর্ষণ

চিরন্তন। তবু তিমি কিম্বা সীলের মত সে সমুদ্রে ফিরে যেতে পারল না। সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ কতকাল ধরে কৌতূহলী মন নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করেছে আর হয়তো ভেবেছে কী করে তার পূর্বসূরীদের মতোই মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় নেবে, তার ধমনীতে প্রবাহিত সেই একই লবণাক্ত রস সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। মন চাইলেও দেহ শঙ্কিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ তার সর্বপ্রকার কলাকৌশল ও বুদ্ধি খাটিয়েছে কী করে সমুদ্রের দূরতম প্রদেশেও সে যেতে পারে, সন্ধান করতে পারে অজানা রহস্যকে। তাহলেই যেন সে মানসিক ও কাল্পনিক দিক থেকে সমুদ্রে পুনঃপ্রবেশের অপরিসীম আনন্দ ও শান্তি লাভ করবে। মানুষ শুধু পিঠে চড়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। সমুদ্রকে সে অঙ্গাঙ্গীভাবে উপলব্ধি করতে চায়। এই প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে কত যে তথ্য জানা গেছে তার সংক্ষিপ্ততম বিবরণ দিতে গেলেও একখানি মহাভারত লিখতে হয়। সুতরাং এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ করা সম্ভব হল।

সমুদ্রের প্রাণী জগৎ

সমুদ্র কেবল লবণাক্ত জল সর্বস্বই নয়, তাতে আছে অফুরন্ত প্রাণ, অগণিত জীবাণু ও প্রাণী—অতি ক্ষুদ্র থেকে অতি বৃহৎ। তাদের অনেকের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ; তাই অবিরত চলছে পাশাপাশি ধ্বংস-সৃষ্টি, জন্ম-মৃত্যু। সমুদ্র পৃষ্ঠেই হল সর্বাধিক ঘনবসতি। কখনও কখনও দেখা যায় কোটি কোটি জেলি মাছের থাকৃতি ভোরের সূর্যা-লোকে ঝিক্‌মিক্ করছে। কখনও আবার কোটি কেটি গাঢ় লাল রং-এর আণুবীক্ষণিক জীবাণু সমুদ্রের লোনা জলকে যেন রক্তবর্ণ করে দিয়েছে। আবার কখনও বা একঝাঁক মাছের পোনা জল থেকে লাফিয়ে ওঠে, সূর্যের আলোর প্রতিফলনে চোখ দেয় ধাঁধিয়ে। গভীর সমুদ্রের মধ্যে দেখা যায় আপাতদৃষ্টিতে জীবনের কোন স্পন্দন যেন নেই। কিন্তু যদি একখানি মিহি ছাঁকনি জলে নামিয়ে দেওয়া যায়,

তাতে অল্প সময়েই অগণিত অতি ক্ষুদ্রকায় একধরনের জীবাণু ধরা পড়বে। এরা হল ডায়াটোস্—একরকম উদ্ভিদকোষ। এককভাবে চোখে দেখাই যায় না। দিনের শেষে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কতশত কোটি অতি ক্ষুদ্রকায় জীবাণু আলোর মেলা বসিয়ে দেয়। এরা অনুপ্রভ। দিনের বেলা অনেক প্রাণী সমুদ্রের গভীরে আশ্রয় নেয়, রাতের অন্ধকারে সমুদ্রপৃষ্ঠে বিচরণ করতে উঠে আসে খাদ্যের সন্ধানে। এদের মধ্যে চিংড়ি জাতীয় স্কুইড্, ম্যাকারেল জাতীয় গেম্‌পাইলাস্ এবং অনেকরকম বড় মাছের বিবরণ জানা যায় নরওয়েবাসী বিজ্ঞানী থর হেয়ারদাল-এর কন্-টিকি অভিযান থেকে। তা ছাড়া আছে অগণিত অনুপ্রভ প্ল্যাঙ্কটন ও অনুরূপ আলোবিকিরণকারী বহুবিধ মাছ। ডায়াটোস্ এবং এককোষী শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ হল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের—এক সে. মি. কিম্বা একটু বেশি—নানারকম প্রাণীর খাদ্য। শেষোক্তরা আবার ততোধিক বড় প্রাণী বা মাছের খাদ্য। এইরূপেই সমুদ্রের খাদ্যবস্তুর শৃঙ্খল পরম্পরা বজায় থাকে। সুতরাং যদি কোন কারণে ডায়াটোস্ এবং শেওলার অভাব ঘটে, তা হলে খাদ্যশৃঙ্খল বিপর্যস্ত হয়, মাছেরা খাদ্যান্বেষণে অন্যত্র চলে যায় অথবা খাদ্যাভাবে সংখ্যায় হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যে-সব দেশের সামুদ্রিক মাছ খাদ্য কিংবা রপ্তানির মালরূপে গণ্য তাদের পক্ষে ঐ খুদে খুদে ডায়াটোস্ ও শেওলার জন্য মাথা ব্যথার অন্ত নেই। ডায়াটোস্‌জাতীয় যে-সব জীবাণু ঘুরে ঘুরে বেড়ায় জলের স্রোতের সঙ্গে, তাদের বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন—গ্রীকভাষায় যার অর্থ ভবঘুরে।

তীরের দূরত্বের সঙ্গে সমুদ্রের জল রং বদলায়। গভীর জলের নীল রং প্রথমেই চোখে পড়ে। স্বচ্ছ জলে সূর্যালোক গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং জলের অন্যান্য পদার্থের অণুসমষ্টি দ্বারা প্রতিফলিত হয়। তার ফলে ঐ অণুসমষ্টি আলোর হলুদ ও লাল রং ধরে রাখে, কেবল নীল রং ফিরিয়ে দেয়। তাই গভীর সমুদ্র জল নীল রং-এর মনে হয়। উপকূলবর্তী জলে প্ল্যাঙ্কটনের আধিক্যের সূর্যালোক গভীরে প্রবেশ

করতে পারে না, তা ছাড়া শেওলাজাতীয় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু অধিক পরিমাণে থাকাতে, লাল ও হলুদ রং-ই ফিরিয়ে দেয়। তাই তীরের কাছের জল হলদে বা লাল রং-এর মনে হয়। কোন কোন জলে লাল অথবা বাদামি রং-ওয়ালা প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে, তার জন্য সেই জল প্রায় স্থায়ীভাবেই লাল রং-এর হয়ে থাকে, যেমন লোহিত সাগরের জল।

কোন ধরনের প্রাণী সমুদ্রের উপরিভাগে বাসা বাঁধবে তা নির্ভর করে প্রধানতঃ খাদ্যের এবং তাপমাত্রার উপর। সমুদ্রের মেরু মহাদেশে তাপমাত্রা আঠাশ ডিগ্রী ফারেন্‌হাইট্; কিন্তু পারস্য উপসাগরে ছিয়ানব্বই ডিগ্রী। সামুদ্রিক প্রাণী এই তাপমাত্রার সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে বাসস্থান ঠিক করে। প্রবাল তৈরী তাপমাত্রার উপর এমনই নির্ভরশীল যে, বিষুবরেখার ৩০° উত্তরে এবং ৩০° দক্ষিণে রেখা টেনে দিয়ে যে ক্ষেত্রটি পাওয়া গেল তারমধ্যেই পৃথিবীর সবরকম প্রবাল পাওয়া যাবে, কারণ ঐ ক্ষেত্রের সমুদ্রজলের তাপমাত্রা প্রায় ৭০ ফা-এর কাছাকাছি, যার ফলে প্রবাল তৈরীর কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। উষ্ণমহাদেশের কোন কোন জায়গায়, যেমন দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা উপযুক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু প্রবাল তৈরী হয় না। কারণ সেখানে অবিরত সমুদ্রতলের ঠাণ্ডা জল উত্তাল হয়ে উপরে উঠে আসে—তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। উষ্ণমহাদেশের উচ্চ-তাপমাত্রার দরুণ প্রাণীর প্রজনন ও সংখ্যা বৃদ্ধির হার মেরুমহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু যেহেতু মেরুমহাদেশের সমুদ্রের উপরিভাগে উষ্ণদেশের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্য বস্তু রয়েছে, তার জন্য মেরুমহাদেশে মৎস্যাদির প্রাচুর্য দেখা যায়। এমন কি উষ্ণমহাদেশে সমুদ্রবিহারী পাখির সংখ্যাও মেরুমহাদেশের তুলনায় নগণ্য, কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠে পাখিদের যথেষ্ট খাদ্য জোটে না। মেরুমহাদেশে মৎস্যের উপযুক্ত খাদ্য ভেসে অন্যত্র চলে যেতে পারে না। সেইজন্য মৎস্যাদি প্রাণী অনায়াসে খাদ্য পায় এবং বংশবৃদ্ধি করে।

উষ্ণমহাদেশের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম থাকার জন্য এবং খাদ্যবস্তুসহ নিচের জল উপরে ওঠার জন্য সেখানে মৎস্যাদির উৎপাদন হার মেরুমহাদেশের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুত সমুদ্রের যেখানেই ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে উষ্ণজল মিশ্রিত হয়ে ঘূর্ণি অথবা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় সেখানেই নানাজাতের সামুদ্রিক প্রাণী অধিক সংখ্যায় উৎপন্ন হয়।

সমুদ্রের মাঝামাঝি জলরাশির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত প্রাণহীন—মরুদেশের মতো উষর। এসব জায়গায় প্রাণিজগৎ গভীর জলের নিচে সীমাবদ্ধ। একমাত্র ব্যতিক্রম সারাগাসো সাগর। আটলান্টিক মহাসাগরের বেরমুডা দ্বীপপুঞ্জের চারিদিক জুড়ে একটি জায়গার সীমারেখা টানা যায় যেখানে দুই বিপরীত স্রোতপ্রবাহের প্রভাবে সমুদ্র শান্ত সমাহিত। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সারাগোসাম্ নামক এক প্রকার সামুদ্রিক শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ চলে আসে। এই শেওলাকে কেন্দ্র করে সেখানে নানাধরণের প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এই উদ্ভিদের পরিমাণ প্রায় এক কোটি টন। কিছু কিছু ঝড়ের প্রকোপে অন্যত্র চলে যায়, আবার নতুন উদ্ভিদ বাইরে থেকে চলে আসে। এমনি করে যেসব উদ্ভিদ জমেছে তারমধ্যে কারোর বয়স একশো'র বেশিও হতে পারে। তৎকালীন নাবিকদের ধারণা ছিল সারাগাসো উদ্ভিদের বাধা অতিক্রম করে জাহাজ চালান অসম্ভব, তাই এ পথ তারা এড়িয়ে যেত—কিন্তু উদ্ভিদগুলি এত বিরাট জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে যে, সে-রকম সম্ভাবনাই ছিল না; ভয়টা ছিল সম্পূর্ণ অমূলক।

বসন্ত আগমনে স্থলভাগে যেমন চারিদিকে অভূতপূর্ব প্রাণের সাড়া পড়ে যায়, সমুদ্রেও তেমনি। শীতের সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় নির্জীব মনে হয়, বসন্ত আগমনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, সমুদ্রের নিচের দিকে যেসব খাদ্যবস্তু জমা ছিল সেসব উপরে উঠতে থাকে। তখন শুরু হয় বংশবৃদ্ধির কাজ। কী দ্রুত তার গতি, কী সে সমারোহ—মাইলের পর মাইল লাল, বাদামি ও সবুজ রং-এর আস্তরণ পড়ে—নতুন নতুন

অতিক্ষুদ্র প্রাণীর (ডায়াটোস, প্ল্যাঙ্ক্‌টন ইত্যাদি) আবির্ভাবের সূচনা। এরপর দেখা দেয় বৃহত্তর প্রাণী যাদের এরাই খাদ্য। বড় বড় মাছদের মধ্যেও তখন সাড়া পড়ে যায় নতুন সৃষ্টির কাজে।

ডুবোজাহাজে অভিযান

সমুদ্রের তলদেশে উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বতশ্রেণী, সমুদ্রপৃষ্ঠে উষ্ণ লোনা জল আর সূর্যের প্রাণদায়ী আলো, এর মাঝখানে যে-বিপুল গভীর জলরাশি, যেখানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে না, চির অন্ধকার, এই অঞ্চলের খবর জানার আগ্রহ অদম্য ; কিন্তু বড় কঠিন। এই প্রচেষ্টায় আজও মানুষ তেমন সফল হয় নি। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জায়গা এমনি নিরন্ধ্র কালো জলে ঢাকা।

স্বতন্ত্রভাবে তৈরী ডুবোজাহাজের সাহায্যে মানুষ যন্ত্রপাতি নিয়ে অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছে ১৯৩৪ সাল থেকে, যখন উলিয়াম বীব্‌ এবং ওটিস্‌ বার্টন প্রথম তাদের ডুবোজাহাজ নিয়ে বেরমুডার কাছাকাছি সমুদ্র তলের প্রায় ৩০২৮ ফুট নিচে নামলো। তখনো এক মাইলের বেশি কেউ নামে নি। তবে অত নিচে গিয়ে বেশিক্ষণ বাস করা অসম্ভব। সুতরাং তারা বিশেষ কোন অনুসন্ধান করার সুযোগ পায় নি। সমুদ্রের নিচে জলের চাপ (প্রতি ৩৫ ফুট নিচে প্রতি বর্গ ইঞ্চি-তে প্রায় ১৫ পাউণ্ড) এত বেশি যে. তার জন্য নানা অসুবিধা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। চাপের প্রভাবে, রক্ত প্রবাহে নাইট্রোজেনের অনুপ্রবেশ বিষের মত কাজ করে। অক্সিজেনের চাপ বৃদ্ধি পেলে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন-ডায়ক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে সে তখন বিষ! আধুনিক ডুবোজাহাজে বাতাসের পরিবর্তে অক্সিজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। হিলিয়াম ব্যবহারের অসুবিধা এই যে, গ্যাসের তাপবাহিকা শক্তি বেশি হওয়াতে সমুদ্রের নিচে খুব ঠাণ্ডা লাগে এবং কথাবার্তাও ভালো শোনা যায় না। এইসব কারণে বেশি সময় জলের নিচে অনুসন্ধান কাজ চালানো কঠিন। বেশি নিচে কাজ করতে হলে অক্সিজেনের অনুপাত অনেকখানি কমিয়ে

দেওয়া দরকার। এছাড়া গভীর জলে বেশিদিন অনুসন্ধান চালাবার সমস্যাও কম নয়। এইসব সমস্যা সমাধান কল্পে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং নতুন নতুন নক্‌শার ডুবোজাহাজও তৈরী হয়েছে। অবিরাম অনেকদিন জলের নিচে থাকার ব্যাপারে গবেষক ডুবুরীর নিরাপত্তাই প্রধান সমস্যা। তার জন্য বহুবিধ প্রস্তুতি ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। অন্যথায় অল্প সময় কাজ করে ফিরে এসে আবার যাওয়া যায়। কিন্তু বারে বারে যাওয়া-আসার বেলায় অন্যরকম সতর্কতার প্রয়োজন হয়, কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠে ফিরে আসার সময় জলের চাপ হঠাৎ কমে গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত ও মস্তিষ্কের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সুতরাং ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়, যাতে দেহের উপর বায়ুর চাপসাম্য বজায় থাকে।

এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০-১২০ মিটার গভীর সমুদ্রতলে অনুসন্ধান চালান হয়েছে এবং ২০০-২৫০ মিটার পর্যন্ত গেলে কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হবে সে-বিষয়ে জানা গেছে। অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়েছে যে, মহাদেশীয় সোপানের গভীরতা পর্যন্ত যাওয়াতে অসুবিধা নেই। সেখানকার চমকপ্রদ তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ক্রমশঃ নানারকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ; সমুদ্রের নিচে একাদিক্রমে অনেকদিন ধরে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্ভব হয়েছে। আমেরিকার নৌ-বাহিনী কর্তৃক প্রস্তুত "সী-ল্যাব"-এ দশ থেকে পনের দিন, এমন কি তিরিশ দিন পর্যন্ত ২০৫ ফুট বা ৯০ মিটার নিচে দশজনের একটি দল গবেষণা কাজ চালিয়েছে। এইসব ডুবুরী কর্মীদের বলা হয় "অ্যাকোয়ানট্"।

ডুবোজাহাজের অধ্যায় শুরু হওয়ার আগে অনেকের ধারণা ছিল যে, গভীর জলের তলায় কোন প্রাণীই বসবাস করতে পারে না। প্রথম যে অভিযানে এই ধারণা বদলে দিল তা ১৮৭২ সালে "চ্যালেঞ্জার" জাহাজ শুরু করেছিল। গভীর জল থেকে কত যে অদ্ভুত এবং অদৃশ্য-

পূর্ব প্রাণী জাহাজের জালে ধরা পড়েছিল তা দেখে বিজ্ঞানীরাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ তৈরী হয় নি, কিন্তু শব্দতরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করে সমুদ্রতলের গভীরতা নির্ণয় করা হত। কখনও দেখা যেত যে, এই প্রতিফলন অপেক্ষাকৃত অগভীর কোথা থেকে এসেছে, অথচ সেখানে কোন কঠিন পদার্থ থাকার সম্ভবনা নেই। পরে জানা গেল যে, ঐ প্রতিফলন আসত সম্ভবতঃ মাছের ঝাঁক থেকে, যেসব মাছ "চ্যালেঞ্জার" জাহাজের জালে ধরা পড়েছিল।

জলের গভীরতা শব্দতরঙ্গের প্রতিফলন এবং ফোটোগ্রাফী ইত্যাদি নানাপ্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করে সামুদ্রিক প্রাণীর সম্পর্ক তথ্য সংগ্রহের কাজ বিভিন্ন সংস্থা এবং ব্যক্তি করে চলেছে তারা সকলেই নানা প্রাণীর সন্ধান পেয়েছে। মনে হয়, সুদূর অতীতে তিমি এবং সীল-ও এইসব গভীর জলের প্রাণীর খোঁজ পেয়েছিল। তাদের দাঁত ও চোয়ালের চেহারা এবং জীবাশ্ম থেকে আন্দাজ করা যায় যে, এরা স্থলভাগের স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্গত। খাদ্যের সন্ধানে এরা কোন কোন সময়ে সমুদ্রের কাছে এসেছিল এবং ক্রমশ; উপকূলবর্তী অঞ্চল ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন থেকেই এদের দৈহিক গঠনও বদলাতে থাকে এবং জলজ প্রাণীর মত স্বল্প অক্সিজেনের দ্বারাই শ্বাসকার্য চালাতে শিখল। কখনও কখনও অক্সিজেন আহরণ করবার জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠে উঠে আসত। এইসব প্রাণীদের মধ্যে তিমি সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তিমি তিনরকমের: প্ল্যাঙ্ক্‌টন-ভোজী, মৎস্য-ভোজী এবং স্কুইড-ভোজী। প্রথমোক্ত তিমিরা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিচরণ করে, সেখানে প্ল্যাঙ্ক্‌টন টনে টনে নিত্য তৈরী হচ্ছে। একটি তিমির বিরাট ক্ষুধা মেটাতে ঐ পরিমাণই প্ল্যাঙ্ক্‌টন দরকার। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিমিরা তীর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় ছোট ছোট মাছের খোঁজে। তৃতীয় শ্রেণীর তিমিদের খাদ্য স্কুইড্—যথেষ্ট পরিমাণে এদের পাওয়া

যায় অনেক গভীরে। মনে হয়, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের আগেই তিমিরা স্কুইড্-এর সন্ধান পেয়েছিল। এইসব তিমির ওজন হবে সত্তর টনের কাছাকাছি, খাদ্যের পরিমাণও তেমনি টন খানেক। এক একটি স্কুইউ্ প্রায় ৩০ ফুঠ দীর্ঘদেহ এবং ৫০ ফুট হাত-পা। বিনাযুদ্ধে স্কুইড ধরা দেয় না। তিমি অবশ্য জয়ী হয়, কিন্তু বিনামূল্যে নয়, তিমির ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখে সেই অনুমানই হয়। গভীর জলের অন্ধকারে দুই বিরাট জন্তুর লড়াই কী ভয়ঙ্করই না হয়! কল্পনা করা যায় না। তৃতীয় শ্রেণী তিমির চর্বি ব্যবহৃত হল বাতি জ্বালাবার জন্য। এদের বলা হয় স্পার্ম্ তিমি।

সীল-ও খাদ্যের খোঁজে গভীর জলে বিচরণ করে। সীলের পেটে গভীর জলে বাস এমনি মাছের কাঁটা পাওয়া গেছে।

অন্ধকারে আলোর রেখা

তিমি গভীর জল থেকে দ্রুত সমুদ্রপৃষ্ঠে চলে আসতে পারে, অথচ হঠাৎ চাপের পরিবর্তনে কোনরকম বিকলতা দেখা যায় না। একই অবস্থায় মানুষের স্নায়ুকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ঘটে, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। যেসব প্রাণী সবসময়ে গভীর জলেই থাকে এবং ওঠা-নামা করে না, তারা সহজেই প্রায় পাঁচ-ছয় টন চাপের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে পারে। একদিকে আলোর সম্পূর্ণ অভাব, অন্যদিকে অত্যধিক চাপ—এই দুইটি অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমুদ্রের গভীর তলদেশের প্রাণী জগতের বৈশিষ্ট্য স্থিরীকৃত হয়।

হাজার থেকে দেড়হাজার ফুট অথবা ২০০ থেকে ৩৫০ মিটার গভীরে সূর্যালোক তেমন পৌছায় না, মাছেরা হয় লাল কিম্বা হালকা বাদামি অথবা কালো রং ধারণ করে। দেড়হাজার ফুটের নিচে প্রায় সব মাছই কালো কিংবা বেগুনি অথবা বাদামি।

কালো গভীর জলে আলোর দেখা কখনও কখনও মেলে—যেন অন্ধকার আকাশে তারার মিট্‌মিটে আলো। কোন কোন মাছেরা দেহে আলো তৈরীর সরঞ্জাম বহন করে—কখনও খাদ্য অথবা শিকার

ধরবার কাজে লাগায়। কখনও বা আলোর ঝলকানি বন্ধু অথবা শত্রু চিনে নিতে সাহায্য করে। অতিগভীর জলে স্কুইড্ একরকম তরল পদার্থ ছিটিয়ে দেয়, দেখতে মনে হয় যেন একটি আলোকময় মেঘখণ্ড। জেলে এবং নাবিকরা 'সমুদ্রের আগুন' দেখে বিস্ময়বোধ করত। এই আলোর জন্য দায়ী এককোষী ভাইনোফ্ল্যাজেলেট জাতীয় জীবাণু। জাহাজের বা মাছ-ধরা জালের ধাক্কায় এরা আলোবিকিরণ করে। এককভাবে এদের আলো অতি ক্ষীণ, চোখে পড়ে না। বহুসংখ্যক জীবাণুর মিলিত আলো দেখা যায়।

কোন কোন মাছের চোখের লেন্সের পরিবর্তন ঘটে অথবা রেটিনাতে 'কোণ'-এর পরিবর্তে 'রড্'-এর সংখ্যা বেশি হয় যাতে অতি অল্প আলোতেও দেখতে পারে, যেমনটি ঘটে নিশাচর পশুপাখির চোখে। আবার ঘন অন্ধকার জলের নিচে কোন কোন প্রাণীর চোখের ব্যবহার মোটেই হয় না, ফলে প্রায় অন্ধই হয়ে যায় কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় অতিশয় শক্তিশালী হয় এবং তার জন্য দাঁড়া বা পাখ্‌না খুব লম্বা হয়। স্পর্শের দ্বারাই খাদ্যাখাদ্য শত্রু-মিত্র প্রভেদ করতে পারে।

মৎস্যজাতীয় প্রাণী গভীর জলে পাওয়া গেলেও দুশো মিটার নিচে কোন উদ্ভিদের চিহ্ন দেখা যায় না। বস্তুতঃ ৬০।৭০ মিটার নিচে সূর্যের আলোই প্রবেশ করে না।

"নিম্নে জাগে সিন্ধুগর্ভ স্তব্ধ অন্ধকার।
কোথা নিবে যায় আলো, থেমে যায় গীত,
কোথা চিরদিন তার অসীম আড়াল ;
কোথায় ডুবিয়া গেছে অনন্ত অতীত॥

(সিন্ধুগর্ভ, কড়ি ও কোমল)

মানুষ বাদে কোন প্রাণীই নিজের খাদ্য তৈরী করে না। এইজন্য তারা অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঝরে পড়া উদ্ভিদ বা মৃত প্রাণীর অবশিষ্ট এদের অন্যতম খাদ্যসম্পদ। কিন্তু এই খাদ্য অপর্যাপ্ত নয় অতএব প্রাণীদের মধ্যে এই নিয়ে অবিরাম

প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তারই ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট প্রাণীর বেলায়ও দাঁত খুব ধারালো হয়, চোয়াল হয় চওড়া এবং দেহের স্থিতিস্থাপকতা ও প্রসারণ ক্ষমতা অত্যধিক। সুযোগ পেলেই ছোট প্রাণী বৃহত্তর প্রাণীকেও গিলে ফেলে এবং অবসর মত রোমন্থন কার্যে ব্যাপৃত থাকে।

সমুদ্রগর্ভ ঘন অন্ধকার অত্যধিক জলের চাপ, অতএব প্রাণ রাখাই দায়। কিন্তু প্রাণশক্তি এমন নাছোড়বান্দা যে অসম্ভব অবস্থাতেও মাথা উঁচিয়ে থাকতে চায়। সমুদ্রেও যে অনন্ত প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, সে-সংবাদ কিছু কিছু জানা গেছে। অনেকেরই ধারণা অন্ধকার সমুদ্র শান্ত স্তব্ধ 'থেমে যায় গীত'। কিন্তু প্রাণ যেখানে চঞ্চল সেখানে স্তব্ধতা আশা করা যায় না। সমুদ্রের গভীর তলদেশে যে-প্রাণীদের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা নীরব মোটেই নয়। নিচে মাইক্রোফোন যন্ত্র নামিয়ে রেকর্ডিং করে কত রকম মর্মর, চীৎকার, গোঙানির আওয়াজ শোনা গেছে তার সীমা নেই। সেই সব আওয়াজ বিশ্লেষণ করে এবং জানা প্রাণীদের আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের চিহ্নিত করা গেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে যাদের দেখা যায় তাদের মত কেউ কেউ গভীরেও যাতায়াত করে এরকম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

অদ্ভুত প্রাণী

সমুদ্রের গভীরে যে-সব প্রাণীদের আবিষ্কার করা হয়েছে তাদের জন্মকাল খুব অতীত নয়, বলা যায় প্রায় সেদিনকার। সম্ভবতঃ প্রতিকূল অবস্থার দরুণ গভীর তলদেশে প্রাণের আবির্ভাব অনেক দেরীতে ঘটেছে। কিন্তু কয়েকটি সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে মনে হয়, এই ধারণা সন্দেহাতীত নয়। ১৯৩৮ সালে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এক চমকপ্রদ মাছ ধরা পড়ে; জেলেরা এরকম মাছ কোনদিন দেখেনি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই মাছটিতে ছ'কোটি বৎসর আগেকার লাটিমেরিয়া বলে চিহ্নিত করেছে। আশ্চর্য এই যে,

এতদিন কোথায় লুকিয়েছিল এবং কীভাবেই বা পরিবর্তিত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে গেল।

আর একরকম হাঙ্গর পাওয়া গিয়েছে নরওয়ে ও জাপানের সমুদ্রে, চেহারা প্রায় আড়াই-তিন কোটি বছরের পূর্বপুরুষদের মত। প্রায় পঞ্চাশটি এই ধরনের মাছ বর্তমানে য়ুরোপ ও আমেরিকার ম্যুজিয়মে রাখা আছে। এরকম আরও যে প্রায়-অসম্ভব প্রাণীরা গভীর সমুদ্রে ঘোরাফিরা করছে না, সে-কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না।

সমুদ্রের তলদেশ

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম সমুদ্রের তলদেশ নিয়ে অনুসন্ধান চলে। পদ্ধতিটি অতি সোজা। সুদীর্ঘ একটি দড়িতে একটা ওজন বেঁধে ছেড়ে দেওয়া এবং তলদেশ স্পর্শ করলে দড়ির দৈর্ঘ্য মেপে তলদেশের গভীরতা জানা। প্রথম দিকে ১২০০ ফুট মাত্র যাওয়া হয়েছিল। ধারণা হল এইটিই সম্ভবতঃ সর্বাধিক গভীরতা। উনিশ শতাব্দীতে প্রায় ২১০০০ ফুট নিচে পর্যন্ত যাওয়া হল। ক্রমশঃ মাপবার যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর দেশ পর্যন্ত যেমন যাওয়া সম্ভব হল, তেমনি অনেক অধিক সংখ্যায় মাপা সহজসাধ্য হল। অসংখ্য পরীক্ষালব্ধ ফল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা এখনও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয় নি। তা সত্ত্বেও সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কতকগুলি তথ্য জানা গিয়েছে। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার সীমারেখা বাদ দিয়ে তিনটি স্থায়ী নিমজ্জমান সামুদ্রিক এলাকা চিহ্নিত করা যায়। যথা—মহীসোপান, মহীঢাল ও গভীর তলদেশ।

মহীসোপান মহাদেশের প্রসারণক্ষেত্র বলা যায়; এক সময়ে হয়ত মহাদেশেরই অংশ ছিল। মহীসোপানের অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে মাছ, সমুদ্রের শেওলা, খনিজ তেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সর্বত্র মানুষের প্রচেষ্টা চলছে এইসব সম্পদকে উদ্ধার করে নিজের কাজে লাগানো। বিভিন্ন সমুদ্রের মহীসোপানগুলি সাধারণতঃ প্রস্থে কুড়ি থেকে একশত পঞ্চাশ মাইল এবং গভীরতায়

৪০০ থেকে ১৮০০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু সুমেরু মহাসাগর অন্তর্গত বেরেন্ট্স্ সাগর প্রস্থে সর্বাধিক প্রায় ৭৫০ মাইল, গভীরতায় বেশীর ভাগই ৬০০-১২০০ ফুট। মহীসোপান পেরিয়ে মহীঢাল এলাকায় গেলেই প্রকৃত সমুদ্রের স্বরূপ চোখে পড়ে। উদ্ভিদের জগৎ ছাড়িয়ে পড়বো প্রাণী জগতে, সেখানে বড় ছোটকে শিকার করছে খাদ্যের জন্য—কখনও কখনও ভেসে আসা সামুদ্রিক উদ্ভিদ অথবা ডুবে যাওয়া মৃত উদ্ভিদের অংশবিশেষ কিঞ্চিৎ খাদ্যের যোগান দেয়। মহীঢালের গড় উচ্চতা (অথবা গভীরতা) ১২০০০ ফুট। কিন্তু কোথাও কোথাও ৩০,০০০ ফুট ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেষ্টের চেয়েও বেশি। প্রশান্ত মহাসাগরে চ্যালেঞ্জার ডীপ-এর গভীরতা প্রায় ৩৫,৬৪০ ফুট। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়োজিত 'ট্রিএষ্টে' অভিজান ১৯৬০ সালে জানুয়ারী মাসে এই সর্বনিম্ন সমুদ্র অভিযান চালায়। তা থেকে সমুদ্র তলের বন্ধুরতা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। কী করে এত সংকীর্ণ অথচ গভীরখাত সমুদ্রতলে তৈরি হল তার সঠিক ব্যাখ্যা এখনও কেউ দিতে পারেনি। মহাদেশীয় সংকীর্ণ গিরিখাতের মতই এদের চেহারা। গুটিকয়েক এমনি খাত আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাদেশের মতই সমুদ্র তলদেশ হঠাৎ উঁচু-নিচু হয়েছে। যখনই পৃথিবীর কেন্দ্রের নরম তরল পদার্থের তাপমাত্রা কমে গিয়ে সংকোচন শুরু হয়েছে, তার মেঝেতে ভাঁজ পড়েছে। সমুদ্রতল যে মোটেই সমতল নয় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ১৯৪৭ সালে শুরু করে ১৫ মাস ধরে সুইডেনের বিজ্ঞানীরা অ্যাল্‌বাট্রস্ জাহাজে চড়ে যে তথ্য জোগাড় করে তাতে জানা যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের বন্ধুরতা সর্বাধিক। ভারত মহাসাগরের তলদেশ অপেক্ষাকৃত সমতল। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশেও অনেকগুলি ছোট-বড় পর্বতশ্রেণী রয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগই সমতল। অনেকের ধারণা সর্বাধিক গভীর তলদেশ সমুদ্রের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত, কিন্তু সর্বাধিক বেশী হল দ্বীপপুঞ্জগুলির

কাছাকাছি এলাকায়। যেমন ফিলিপাইন্‌স্‌, জাপান, এল্যুসিয়ান, ওয়েষ্ট ও ইষ্ট্‌ ইণ্ডিজ ইত্যাদির নিকটবর্তী জায়গায় অনেকগুলি গভীর খাত আবিষ্কৃত হয়েছে। ফিলিপাইন্‌স্‌-এর নিকটবর্তী মিন্ডানাও এবং জাপানের নিকটবর্তী টুস্কারোরা খাত দু'টির গভীরতা প্রায় ছয় মাইল। সুমেরু মহাসাগরের তলদেশ সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য জানা যায় নি—যদিও কয়েকটি অভিযান চালানো হয়েছিল। চিরতুষার এলাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসুবিধা প্রচুর। ১৯৩৭-৩৮ সালে রুশ বিজ্ঞানীরা তুষার দেশে বসবাস করেছিল এবং তলদেশের গভীরতা ও অন্যান্য কিছু কিছু তথ্য জানার জন্য পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল। উইল্‌কিন্‌স্‌ পরিচালিত নটিলাস ডুবোজাহাজ তুষার সাগরের নিচে নেমে পরীক্ষা করার প্রচেষ্টা করে—কাজটি যথেষ্ট দুঃসাহসের ছিল সন্দেহ নেই ; কিন্তু যন্ত্র বিকল হয়ে পড়াতে কয়েকদিনের মধ্যে অভিযানটি বন্ধ করে দিতে হয়। অন্যান্য তথ্যাদি অনুসরণ করে বলা যায় যে, সম্ভবত সুমেরু উপসাগরের তলদেশও অন্যান্য মহাসাগরের মতই বন্ধুর।

সমুদ্রদেশের গভীর-অগভীর খাতের কথা বলা হল। সেখানে মহাদেশের মত বহু পর্ব্বতশ্রেণীও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের চেহারা ও অবস্থান মোটামুটি জানা হয়েছে ; কয়েকটি অতিশয় বিষদরূপে, যেমন ১০,০০০ মাইল দীর্ঘ আটলান্টিক রিজ্‌। এটি আইস্‌ল্যাণ্ড থেকে শুরু করে দক্ষিণদিকে গিয়ে বিষুবরেখা পেরিয়ে দক্ষিণ আটলান্টিকে পড়ে। সেখান থেকে ৫০° দক্ষিণ-অক্ষাংশ অনুসরণ করে। তারপর হঠাৎ পূর্ব-দিকে আফ্রিকার সর্বোপরি এলাকা ছুঁয়ে ভারত-মহাসাগরের দিকে চলতে থাকে। সম্ভবত মহাদেশীয় স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে এই পর্বত-শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। আজোরস্‌-এর পিকো দ্বীপ আটলান্টিক রিজ-এর সর্বোচ্চ অংশ সমুদ্রতল থেকে প্রায় ২৭,০০০ ফুট উর্ধ্বে, তার মধ্যে মাত্র ৭০০০-৮০০০ ফুট জলের উপরিভাগে অবস্থিত। আধ কিলোমিটারের মধ্যে এখানেও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ দেখা যায়। প্রশান্ত ও ভারত-

মহাসাগরে নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণী আটলান্টিকের তুলনায় সংখ্যায় ও দৈর্ঘ্যে খুবই কম। কিন্তু ভারত-মহাসাগরে একটি সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী আছে যেটি ভারতবর্ষ ও কুমেরু মহাদেশের মধ্যে সংযোগসাধন করেছে ; এটি আটলান্টিক রিজ-এর চেয়েও চওড়া।

মহাদেশীয় পর্বতশ্রেণীর উৎপত্তির কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি। মহাসাগরীয় পর্বতশ্রেণীও একই অবস্থায় জন্মলাভ করেছে। কিন্তু মহাদেশীয় পর্বতশ্রেণী জন্ম থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং বৃষ্টি-বাত্যা, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। পুরাতন সব পর্বতের নিয়তি একই—মৃত্তিকায় ও ধুলায় পরিণতি এবং জলের দ্বারা প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সমুদ্রের তলদেশে অবস্থান। মহাসাগরীয় পর্বতকে অনুরূপ কোন অবক্ষয়কারী শক্তির সম্মুখীন হতে হয় নি, বাদে সেইসব পর্বত যাদের বড় বেশী বাড়, সমুদ্রপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে উপরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। অনতিবিলম্বে তাদের মাথা কাটা যায়। ঐ কবন্ধ অবস্থায় তাদের শান্তি কেউ ভঙ্গ করতে পারে না, তাদের চেহারা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

মৈনাক পর্বতের ডানাকাটা হয় নি, অন্যান্য পাহাড়ের ডানাকাটা। ডানাসমেত মৈনাক সাগরের জলে লুকিয়ে থাকে—পুরাণকারের এই কথা নস্যাৎ করে আজকের বিজ্ঞানীরা বলেন মৈনাক কবন্ধ। অনেক রকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে নিমজ্জিত শৈলশ্রেণীদের সম্পর্কে। প্লেটো বর্ণিত আটলান্টিস্ সম্পর্কে বলা হয় যে, একসময় ওখানে দুর্ধর্ষ গ্রীকদের বাস ছিল, কিন্তু একদিনের ভূমিকম্পের ও প্লাবনের তাড়নায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং মহাদেশ থেকে আটলান্টিস্ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আটলান্টিক রিজ্ সম্পর্কেও অনুরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই এইসব কিংবদন্তীর অসম্ভাব্যতা ধরা পড়ে। ঐ সব মহাসাগরীয় পর্বতশ্রেণীর জন্মকালে মহাদেশে কোনরকম প্রাণীরই আর্বিভাব হয় নি। সুতরাং সবগুলি

কাহিনীই সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত। আর এক পদ্ধতিতে মহাদেশীয় কোন দ্বীপ সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হতে পারে, যেমন ঘটেছিল উত্তরসাগরের ডগার ব্যাঙ্ক-এ। হিমবাহ সমুদ্রের জল টেনে নিলে জলের অল্প নিচের জমি অথবা পর্বতচূড়া ডাঙায় পরিণত হতে পারে এবং ক্রমশ প্রাণী জগৎ বিস্তার লাভ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষাদি এবং অন্যান্য উদ্ভিদও। অনেক অনেক বছর পরে যদি হিমবাহ গলে যায় তাহলে সমস্ত ডাঙা জমি সমুদ্রের লেভে্ল-এর নিচে নেমে যাবে। ডগার ব্যাঙ্ক-এর উৎপত্তিও এইভাবে হয়েছিল এবং জলের তলে তলিয়ে গিয়েছিল। যে-সব মানুষ ডাঙা দেখেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেঁচে গিয়ে এই কাহিনীকেই রঙ চড়িয়ে প্রচারিত করেছে। পরবর্তী যুগে আরো কত রঙ চড়িয়ে ক্রমশঃ একটি কিংবদন্তী রচিত হল ;—তার মধ্যে স্বভাবতই কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনাও প্রক্ষিপ্ত হল।

সমুদ্রের তলদেশ কেবল কঠিন প্রস্তর দিয়ে ঢাকা নয়। মহাদেশীয় পর্বতমালা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকায় ঢাকা। সেই মৃত্তিকা আশ্রয় করেই উদ্ভিদরাজ্য গড়ে উঠেছে। মহাসাগরীয় পর্বতমালা মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হতে পারে না বটে, কিন্তু যুগ যুগ ধরে মহাদেশীয় মৃত্তিকা এবং অন্যান্য জিনিস সমুদ্রতলে আশ্রয় নিয়েছে। স্তরে স্তরে তাদের বিন্যাস, রাসায়নিক উপকরণ ইত্যাদি জেনে সমুদ্রতলের, তথা মহাদেশের, পুরোনো অনেক তথ্য উদ্ধার করা যায়। এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রতলের স্তরীভূত বস্তু-সামগ্রী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই স্তরগুলির গভীরতা এক থেকে বারো হাজার ফুট পর্যন্ত পাওয়া গেছে। স্তরগুলির গভীরতা নির্ভর করে সমুদ্রতলের জলস্রোত, ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাতের কার্যকারিতার উপর।

এইসব বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে কেবল যে মৃত্তিকাই পাওয়া যায় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষও থাকে। নাতিশীতোষ্ণ সমুদ্রতলে ফোরামিনিফেরা-জাতীয় এককোষী জীবের

দেহাবশেষ এদের মধ্যে অন্যতম উপাদান। আর থাকে নানাবিধ জটিল অথচ সুন্দর সুন্দর ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তৈরি জিনিস। এত ক্ষুদ্র যে, এদের জটিল গঠন দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। ক্ষুদ্র হলেও কোটি কোটি বছর ধরে জমা হয়ে লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল সমুদ্রতল অধিকার করে আছে। অনেক জায়গায় এই স্তরের গভীরতা এক হাজার ফুটেরও বেশী। গভীর জলের তলায় কার্বন ডায়কক্সসাইড্-এর পরিমাণ খুব বেশী, অতএব ক্যালসিয়াম্ কার্বনেট দ্রবীভূত হতে পারে। অথচ স্বল্প দ্রবণমাত্রার জন্য সিলিকন যৌগের প্রাধান্য অনেক বেশী। এইসব সিলিকনভিত্তিক যৌগের গঠনও অত্যন্ত জটিল, অথচ কত সুন্দর। এদের বলা হয় রেডিওলারিয়ান্; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গঠন-কারুকার্য দৃষ্টিগোচর হয় না। উত্তর প্রশান্ত-মহাসাগরের তলদেশে রেডিওলারিয়ান্-এর প্রাচুর্য দেখা যায়।

সমুদ্রতলে আর একটি বিস্ময়কর কারিগর রয়েছে, তাদের বলা হয় প্রবাল। চীনের বিরাট দেওয়াল ২২৪০ কি· মি. দীর্ঘ; দেড় মিটার দীর্ঘ বুদ্ধিমান শিক্ষিত কারিগর তৈরি করেছে। তার তুলনায় প্রবালের কর্মকুশলতা বিস্ময়কর। অষ্ট্রেলিয়া থেকে মকরক্রান্তি রেখা পর্যন্ত ২০০০ কি. মি. বিস্তৃত গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ্ নামে শৈলশ্রেণী তৈরি করেছে ৮ মি· মি দীর্ঘদেহ প্রবালেরা। কী অপরূপ এবং সূক্ষ্মতার কারুকার্য! প্রবালেরা যেখানে সেখানে কাজ করতে পারে না। অনুকুল পরিবেশ হল ৩% লবনত্বযুক্ত জল এবং ১৮ সে· অধিক তাপাঙ্ক। ভারত-প্রশান্ত-মহাসাগরে, লোহিত-সাগরে, আটলান্টিকের কোন কোন জায়গায় প্রবালের পক্ষে অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়। ভারতে কচ্ছ উপসাগরের, ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্ত্তী মনমার উপসাগর অঞ্চলের এবং আন্দামান-নিকোবরের লাক্ষাদ্বীপের প্রবাল অত্যন্ত মনোরম।

প্রবাল নানা রঙ-এর ও গঠনের। প্রবালের ব্যবহারও বহুবিধ।

অলঙ্কার, ঔষধ, বিষ প্রতিষেধকরূপে প্রবালের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আছে।

সবরকম প্রবালই আকর্ষণীয় নয়। সাধারণ প্রবাল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয় সিমেন্ট তৈরির জন্য, কারণ প্রবালের রাসায়নিক উপাদান হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট। মানুষের ক্ষুধা মেটাতে হাজার হাজার বছরের প্রবাল সঞ্চয় অল্পসময়ের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। খনিজ তেলের সন্ধান কার্যে রত মানুষ প্রকৃতির এমনি একটি অপরূপ সৃষ্টিকে মুহূর্তে উচ্ছেদ করতে দ্বিধাবোধ করে না। দুঃখের বিষয় এইসব দুষ্কর্মের পরিণতি সম্পর্কে মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন।

কুমেরু মহাসাগরের তলদেশ এবং জাপান থেকে আলাস্কার মধ্যবর্তী উত্তর প্রশান্ত সাগরীয় তলদেশে ডায়াটোম্-এর দেহাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এদের দেহের বাইরেও সিলিকন যৌগের নানা ধরণের নমুনার আবরণ লক্ষ্যণীয়।

আট্‌লান্টিকের অপেক্ষাকৃত অল্পগভীর তলদেশে টেরোপড নামে এক শামুক জাতীয় প্রাণীর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে ; এদের চেহারা অভিনব সৌন্দর্যমণ্ডিত। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম তলদেশে পাওয়া যায় লাল রঙ-এর কাদামাটি। অত গভীরেও এই কাদামাটিই টিকে থাকতে পারে।

আর সব রকম যৌগই জলের প্রচণ্ড চাপে দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই মাটির সম্পর্কে আমাদের এখনও অনেক তথ্য জানতে বাকি আছে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হবে সমুদ্রের জীবনী কথা।

দ্বীপের ভালোমন্দ

ডাঙার মানুষের সমুদ্রভীতি জন্মগত। সুতরাং সমুদ্রের মাঝখানে ডাঙা দেখতে পেলে ভরসা পায়। সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপ কখনও কখনও এমনি জন্মলাভ করে—প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতই এর একমাত্র কারণ। সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত অংশ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে প্রাণীজগতের বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নিচের অংশ থাকে অপরিবর্তিত। যে সব আগ্নেয়গিরির

মাথা জলের উপরে ওঠে না, তারা সৃষ্টি করে মগ্ন শৈলশ্রেণী। এরকম বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট শৈলশ্রেণী সমুদ্রে ছড়িয়ে আছে। কোন কোন মগ্ন শৈল নিমজ্জিত দ্বীপের অংশমাত্র। নাবিকদের পক্ষে এদের অবস্থান ও উচ্চতা জানা একান্ত প্রয়োজন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় দ্বীপগুলি নাবিকদের মনে আশা সঞ্চার করে। মাঝে মাঝে এইরকম দ্বীপ চোখে পড়ে আবার অল্পসময়ের মধ্যেই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অগ্ন্যুৎপাত যেমন এদের জন্মের কারণ, অন্তর্ধানের পিছনে রয়েছে অগ্ন্যুৎপাত এবং সমুদ্রজলের তীব্র সংঘাত ও বিক্রিয়া।

জাভা সুমাত্রার মধ্যবর্তী সুণ্ডা প্রণালীতে ক্রাকাতোয়া দ্বীপে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে প্রথম একটি অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। তার প্রায় দু'শো বছর পরে পর্যায়ক্রমে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের সূচনা দেখা দেয়। তার কিছুদিন বাদে এক প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে, পর পর অনেকগুলি বিস্ফোরণের ফলে ১৪০০ ফুঠ উঁচু দ্বীপটি প্রায় হাজার ফুট গভীর একটি গহ্বরে পরিণত হয়। দ্বীপটির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেবার জন্য অবশিষ্ট ছিল একটি কোণের একটু অংশ। বিস্ফোরণ এত সুতীব্র ও পরিব্যাপ্ত ছিল যে তার শব্দ ৩০০০ মাইল দূরে শোনা গিয়েছিল। জলতরঙ্গের আঘাত অনুভূত হয়েছিল ইংলিশ চ্যানেল পর্যন্ত। উর্ধ্বে উত্থিত ধূলোবালি সারা পৃথিবীকে একবছর ধরে আবৃত করে রেখেছিল। এই বিষণ্ণ অবস্থার মধ্যেও সূর্যাস্তকালে ধূলার ক্ষীণ আবরণজনিত বর্ণচ্ছটা শিল্পীর চোখে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। সে আনন্দের মূল্য কম নয়। ১৯২৯ সালে ঐ জায়গায় অগ্ন্যুৎপাতের ফলস্বরূপ আর একটি ছোট দ্বীপের জন্ম হয়। তার নাম হল ক্রাকাতোয়ার সন্তান—আনার্ক ক্রাকাতোয়া। এই বিস্ফোরণ মানুষের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। অনুমান করা হয় যে, ক্রাকাতোয়ার জন্ম হয়েছিল ভীষণতর একটি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। শৈলদ্বীপ বা মগ্নশৈলগুলিতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অবিরত ভাঙাগড়া চলছে। সেখানকার জল-হাওয়া প্রায়ই খুব উত্তপ্ত থাকে। যেখানে জল-হাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল সেখানে জলে মৎস্যাদি এবং উপরে স্থল-

ভাগে নানারকম পাখী বসবাস করে। আবার কতগুলি সামুদ্রিক দ্বীপের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, যথা—সেন্ট্ পল পর্বতরাজি, সেখানে জীবনের চিহ্ন প্রায় বিরল। কোথাও কোথাও মাকড়শা জাল বিস্তার করে আছে পোকা ধরবার জন্য, কোথাও আবার অদ্ভুত ধরনের মৎসজীবী কাঁকড়া দেখা যায়। অথবা একরকমের প্রজাপতি যারা কেবল পাখির পালক খেয়ে জীবনধারণ করে। নানারকম পদ্ধতিতে সমুদ্রস্থিত শৈলদ্বীপে প্রাণীজগতের আবির্ভাব ঘটে। প্রত্যেকটির ইতিহাস কোন না কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র, কিন্তু বেশীরভাগ দ্বীপেই জল-হাওয়া অথবা পাখির সাহায্যে গাছপালা পোকামাকড় ইত্যাদির সৃষ্টি ও বিনাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবজন্তু গাছপালায় বৈচিত্র্য যে-কোন গবেষকের চিন্তার খোরাক যোগায়। গালাপাগোস্ দ্বীপে অবস্থিত পরস্পর নির্ভরশীল প্রাণীদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেই বিবর্তনবাদের চিন্তা তরুণ বিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইনের মনে উদয় হয়েছিল। মনুষ্য অধ্যুষিত এই সব দ্বীপ সহাবস্থানের চরম দৃষ্টান্তস্থল। নাবিকরা এইসব দ্বীপ পরিদর্শন করে নানা চমকপ্রদ ঘটনা বিবৃত করেছে। ওখানকার জীব-জন্তুরা মানুষকে ভয় করে না বরং কৌতুহলের সঙ্গে সখ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ নিয়ে গেছে সে-সব শান্তিপূর্ণ জায়গায় ধ্বংসের বীজ—নিজের প্রয়োজন মেটাতে নিয়ে গেছে গবাদি পশু, বিড়াল, কুকুর। ক্রমশ ইঁদুর, পোকা-মাকড় দ্বীপবাসীদের শান্তির নীড় ভেঙে দিয়ে সৃষ্টি করেছে প্রতিকূল পরিবেশ, ধীরে ধীরে আদিম প্রাণীজগৎ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সর্বত্র একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমশ মানুষ নিজের ধ্বংসও যে টেনে এনেছে, তার আভাস চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। পরিবেশসাম্য বলতে কি বোঝায় তার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল ছিল এইসব দ্বীপগুলি; তারা লুব্ধ মানুষের অত্যাচারে দ্রুত হারে লোপ পাচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বটে; কিন্তু তার প্রকৃত ভিত্তি-ই ত মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারলো না। দুস্তোষ্য ক্ষুধার ও লোভের কী বীভৎস পরিণতি!

সমুদ্রজলের লেভ্‌ল (অনুভূমিক)

সমুদ্রজলের লেভ্‌ল্ জোয়ার ভাঁটার প্রভাব বাদেই বছরের পর বছর উঁচুর দিকে বেড়ে যাচ্ছে। যেন ক্রমশ সমুদ্র মহাদেশের উপর অধিকার বিস্তার করতে উদ্যত। সমুদ্রের বাড়তি জল মহাদেশীয় গভীর স্থানগুলি ভরতি করে সাগর ও উপসাগর সৃষ্টি করছে। যেমন ভূমধ্য, লোহিত, বেরেণ্ট্‌স্, বেরিং, চীন, বল্‌টিক সাগর, এবং হাড্‌সন্, বঙ্গ, চীজ্‌পিক্ উপসাগর প্রভৃতি। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত জলরাশি ভূ-পৃষ্ঠের কোন কোন অংশ নিমজ্জিত করেছিল, এরকম পৌরাণিক ও আধুনিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার কোথাও কোথাও নতুন ভূপৃষ্ঠের উদ্ভব হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের যে-অংশ সমুদ্র সংলগ্ন সেখানে কোন রকমে একটু ঢালু পেলেই জল প্রবেশ করে এবং ক্রমশ মহাদেশের ভিতরমহল আত্মসাৎ করে, এই হল সমুদ্রজলের বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া বৃষ্টির জলে এবং সমুদ্রজলের আঘাতে মহাদেশীয় মৃত্তিকা প্রস্তরাদি অবক্ষয়ের ফলে সমুদ্রের তলে পতিত হয়। এই ভাবে হাজার হাজার ফুট পর্যন্ত পাল-মাটি জমতে পারে, তার-ই ফলে জলের লেভ্‌ল্ উঁচুতে উঠে যায়। সব চেয়ে প্রধান কারণ হল সুমেরু মহাদেশীয় হিমবাহ। হিমবাহ গলে গিয়ে বিরাট জলরাশির সৃষ্টি হয় এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র জলের লেভ্‌ল্ বাড়িয়ে দেয়। আবার যখন হিমবাহ গঠিত হতে থাকে নিমজ্জিত অংশ ডাঙায় পরিণত হয়। এরকম ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। হিমবাহ কেন তৈরি হচ্ছে আর কেন-ই বা গলে যাচ্ছে তার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে হিমবাহের সৃষ্টি ও অন্তর্ধানের ফলে জলের লেভ্‌ল্ অনায়াসে ২০০-৪০০ ফুট ওঠা-নামা করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

সমুদ্রের ঢেউ

সমুদ্রের ঢেউ অফুরন্ত, গুণে শেষ করতে পারে কি কেউ? তা সত্ত্বেও ঢেউ গুণবার জন্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢেউ-এর সংখ্যা উচ্চতা, বিস্তার, তেজ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক মাপ অবিরাম স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্র সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। এই সব তথ্য থেকে সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। ঢেউ-এর বৈশিষ্ট্য হল এই যে মাঝ সমুদ্রের ঢেউ তীরে এসে আঘাত করে বটে কিন্তু সেখানকার জল অনড়ই থাকে। ঢেউ কত উঁচু হবে নির্ভর করে বিশেষভাবে বাতাসের গতি ও সমুদ্রজলের গভীরতার উপর। বাতাসের গতি ও তেজ যত বেশী হবে ঢেউ-এর বিস্তার (ঢেউ-এর দু'টি পাশাপাশি চূড়ার মধ্যের দূরত্ব) তত বেশী, তেমনি উচ্চতাও। সমুদ্রে বাত্যা বা ঝঞ্ঝার গতিবেগ এত বেশী হতে পারে যে ঢেউ-এর বিস্তাব ৬০০-৮০০ মাইল পর্যন্ত সম্ভব। ঢেউ-এর উচ্চতা যখন বিস্তারের এক সপ্তমাংশ, তখন ঢেউ ভেঙে পড়ে এবং তেজ ও গতিবেগ কমে যায়। সমুদ্রের উদ্ভূত ঢেউ বায়ুর তাড়নায় যদি তীর-গামী হয়, তাহলে দেখা যায় যে ক্রমশ তেজ ও উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, মাঝপথে নানা দিকের বাতাস ঢেউকে উত্তাল করে তোলে। কিন্তু উচ্চতার সীমা ছাড়িয়ে গেলে ঢেউ যায় ভেঙে এবং গতি পায় হ্রাস। ঐ অবস্থায় তীরের দিকে আসতে অপেক্ষাকৃত অগভীর মহীসোপানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গতি আরো কিছুটা কমে যায় এবং তীরের সংঘর্ষে ফেনিল ও সরব ঊর্মিমালায় পরিণত হয়। ঢেউ-এর উচ্চতা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। পঁচিশ ফুটের অধিক উচ্চ ঢেউ সচরা-চর দেখা যায় না। তবে ঝড়ের প্রকোপে উচ্চতা অনায়াসে দ্বিগুণ হতে পারে। কোন কোন সমুদ্র অভিযানের নাবিকদের মতে ঢেউ ষাট থেকে একশো ফুটেরও বেশী দেখা গিয়েছে। ঢেউ-এর ধ্বংসশক্তি সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা নানা রকমের—ছ'হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের জিনিস ঢেউ-এর মুখে তৃণবৎ ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গেছে। এই বাস্তব অথচ অবিশ্বাস্য ধ্বংসের বহু তথ্য সংকলিত হয়েছে। বাত্যা-চালিত ঢেউ-এর অমিত তেজের সামনে যেই পড়ুক না কেন তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।

ঝঞ্ঝাতাড়িত ঢেউ-এর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে ঝড়ের গতি-প্রকৃতি ও আতিশয্যের উপর। এত দ্রুত গতিতে জলের লেভ্‌ল্ বাড়ে যে প্রায়

অতর্কিত অবস্থায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, এমন কি প্রতিরোধের সুযোগও পাওয়া যায় না। এ-রকম কয়েকটি ঢেউ-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৯৩৭ সালে বঙ্গোপসাগরের ঝঞ্ঝাতরঙ্গ তার মধ্যে অন্যতম ; এই বিপর্যয়ে প্রায় কুড়ি হাজার নৌকা এবং তিন লক্ষ লোক জলমগ্ন হয়েছিল।

আর এক রকম ঢেউ-এর বিষয়ে জানা গিয়েছে—সমুদ্রের নিচে তার অবস্থিতি ;—সমুদ্র পৃষ্ঠ শান্ত অথচ কী রহস্যজনক কারণে অবিরত নিমজ্জিত ঢেউ প্রবাহিত হচ্ছে। অনেক সময়ে জাহাজ আচম্বিতে থেমে গেল এই ঢেউ-এর প্রভাবে। অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে বাধা অতিক্রম করা যায়। বিভিন্ন গাঢ়তাসম্পন্ন লবণাক্ত জলের স্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়ার দরুণ অদৃশ্য ঢেউ-এর উৎপত্তি, এইরকম অনুমান করা হয়।

জাপানে, অ্যাকুসিয়ান ও আটাকামার সমুদ্রখাতে উদ্ভুত একপ্রকার ঢেউ-এর ধ্বংসলীলা প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হয়েছে। হঠাৎ এই-তরঙ্গমালা সহস্র সহস্র ফণাতুলে তীরের দিকে অগ্রসর হয়, তার ফলে ঘরবাড়ী, নৌকা-জাহাজ জনপ্রাণী ছিন্নভিন্ন করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এদের বলা হয় 'সুনামি'। সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে এই বিধ্বংসী ঢেউ-এর জন্ম। 'সুনামি'-র গতি প্রকৃতি এখন প্রায় সম্পুর্ণরূপে জানা গিয়েছে, তার ফলে সময়মত সতর্কসংকেত দেওয়া যায়। এই জন্য 'সুনামি'-প্রবণ সমুদ্রক্ষেত্রে বহুসংখ্যক যন্ত্রপাতি সহ সংকেত-কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কোনরকম আশঙ্কার কারণ হলেই অবিলম্বে এদের মধ্যে সংযোগসাধন করা হয় এবং বিপৎকালীন সংকেত ধ্বনি প্রচারিত করা হয়।

সমুদ্রস্রোত

বায়ুপ্রভাবে ঢেউ-এর উৎপত্তি বলা হয়েছে। কিন্তু আরও দুইটি স্থায়ী কারণে সমুদ্র জলে আলোড়ন ওঠে। একটি হল আপন অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তন যার ফলে দিন-রাত্রি ঘটে। অন্যটি হল চন্দ্র ও

সূর্যের, বিশেষ করে চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটার টান। এই দুইটি কারণের স্থায়ীত্বের জন্য সমুদ্রে যে-স্রোতের সৃষ্টি হয় সে-সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পরেও এই দুইটি প্রভাবের তেমন কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সমুদ্রের জলের উপর পৃথিবীর আবর্তন ও চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ সম্পর্কে অনুধাবন করতে হলে কিম্বা সমুদ্রের অবস্থা বৈগুণ্য নিরীক্ষণ করতে হলে পৃথিবীর বাইরে কোন দেখার জায়গা কল্পনা করতে হত। এখন আর কল্পনার দরকার নেই ; কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে নিরীক্ষণ কার্য অনায়াস সাধ্য হয়েছে। মহাদেশীয় বায়ু প্রবাহের কারণ-ও হচ্ছে সমুদ্রের অবস্থিতি। সূর্য কিরণ তাপে স্থলভাগ ও জল ভাগের তাপাঙ্কের বিভেদ ঘটে, তারই জন্য বাণিজ্য বায়ু ও মৌসুমী বায়ুব উৎপত্তি। এই দুইটি বায়ুপ্রবাহ মহাদেশীয় আবহাওয়ার জন্য বহুলাংশে দায়ী। যে-কোন গতিশীল বস্তু—বায়ু, জল, পাখি, জাহাজ, এমন কি বন্ধুকের গুলি—পৃথিবীর আবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। সেই কারণে উত্তর গোলার্ধের সমুদ্রজল ডান দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার মত এবং দক্ষিণ গোলার্ধের জল বামদিকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে বেঁকে যায় এবং ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণির সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ফরাসী বিজ্ঞানী কোরিওলিস। যেহেতু আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রচুর বাণিজ্যিক জাহাজের গমনাগমন ছিল, বহু প্রাচীন কাল থেকে এইরূপ জলস্রোতের সঙ্গে নাবিকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেখানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবই প্রবল। কুমেরু মহাসাগরের জল পৃথিবীকে ঘিরে আছে। সেখানকার জল অবিরত পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু প্রবাহের প্রভাবে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

উৎপত্তি, গতি ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে, বিশেষ করে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে, কয়েকটি সমুদ্র স্রোতের অবস্থান নির্ধারিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আটলান্টিকের বেঙ্গুয়েলা স্রোত, উপসাগরীর স্রোত, ল্যাব্রাডর স্রোত, নিরক্ষরীয় স্রোত; প্রশান্ত

মহাসাগরের হুম্‌বোল্‌ট্‌ স্রোত, জাপান স্রোত ; এবং ভারত মহাসাগরের আগুল্‌হাস এ মোজাম্বিক স্রোতের নাম উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রের আচরণ, সামুদ্রিক প্রাণীর জীবনযাত্রা ও বংশবৃদ্ধি, উপকূলবর্তী মহাদেশগুলির আবহাওয়া ইত্যাদি সমুদ্র স্রোতের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উপকূলবর্তী বাত্যা-ঘূর্ণির উৎপত্তির মূলে-ও এই সমুদ্র স্রোত এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ু স্রোত। অন্য দিকে সমুদ্র স্রোত ও বায়ু স্রোতের সংযোগে সমুদ্র তলদেশের জল উত্তোলিত হতে পারে। তারই সাথে আসে খনিজ পদার্থ, প্ল্যাঙ্ক্‌টন্‌-ডায়াটোম সমৃদ্ধ জলরাশি ; এদের সহায়তায় বিরাট বিরাট সামুদ্রিক মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে।

একদিকে যেমন সমুদ্র উত্তাল হয়ে তলদেশের জল উপরে নিয়ে আসে, অন্যদিকে কোথাও কোথাও বিরাট জলরাশি সমুদ্র পৃষ্ঠ ছেড়ে তলদেশে প্রবেশ করে। এই বিপুল জলপ্রবাহ সমুদ্র জলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে ; এবং এক সমুদ্রের জল অন্য সমুদ্রের সাথে মিশ্রিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সবই ঘটে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা

বায়ুর তাড়নায় সমুদ্রের জল আলোড়িত হয়, যেমন হয় পৃথিবীর আবর্তনের জন্য। এই আলোড়ন পৌঁছয় পাঁচ-ছ'শো ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত। তার নিচে অনুভূত হয় না। কিন্তু একবিন্দু জলও, যেখানেই থাক না কেন, চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়! তত্ত্বের দিক থেকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু অপর যে-কোন বস্তুর আকর্ষণের এলাকায় পড়তে বাধ্য। কিন্তু চন্দ্র-সূর্য ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণ দূরত্বের জন্য এতই কম যে নগণ্য বলা যায়।

সূর্যের ভর চন্দ্রের ভরের চেয়ে প্রায় তিন কোটি গুণ বেশী সত্ত্বেও পৃথিবীর উপর চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ প্রভাব দ্বিগুণ। এই আকর্ষণের ফলে

প্রত্যহ দু'বার চারশো থেকে দুই হাজার কোটি মেট্রিক টন জল ওঠা-নামা করে জোয়ার-ভাঁটার সময়। এই বিরাট জল রাশির সঙ্গে বিপরীতগামী জলরাশির সংঘাত ঘটলে প্রচণ্ড ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এইসব জায়গাগুলি নাবিকদের জানা এবং ঐ ঘূর্ণি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। 'ওডিসি'-তে হোমার বর্ণিত কেরিব্‌ডিস্ (মেসিনা পয়ঃপ্রণালীতে অবস্থিত) এই রকমই একটি ঘূর্ণি জল। এই ঘূর্ণি জলের সঙ্গে গভীর সমুদ্র তল থেকে নানাবিধ জীবাণু ও প্রাণী উপরে উঠে আসে। তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য মেসিনাতে একটি সমুদ্র বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে।

চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ পক্ষপাতিত্বহীন হলেও সর্বত্র একই রকম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই আপাত বিভ্রান্তিকর উক্তিটির প্রকৃত কারণ এই যে, আকর্ষণ এক হলেও, কতটা জল, কত উঁচুতে উঠবে, কখন উঠবে ও নামবে, সেটি নির্ভর করে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর, অর্থাৎ জলাধারটি কতখানি গভীর, তলদেশ কী পরিমাণ ঢালু এবং জল প্রবেশ ও নির্গমনের পথটি কত চওড়া ইত্যাদি। কাজেই কোথাও দেখা যাবে জোয়ার কালে এক কি দুই ফুট মাত্র জলের উচ্চতা বাড়ে, কোথাও পঞ্চাশ ফুট; কোথাও জোয়ার-ভাঁটার সময় এগিয়ে পিছিয়ে হচ্ছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোষ্ট্ ও জিওডেটিক্ সার্ভে সংস্থা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ জোয়ার-ভাঁটার সময় ও জলের উচ্চতা সঠিক বলে দিতে পারে, যদি ঐ জায়গায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য জানা থাকে।

পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটার তারতম্য আরো একটি বিষয়ে দেখা যায়। দিনে দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাঁটা হবে, না মাত্র একবার—সে-সম্পর্কে নিয়ম নেই। কোথাও দু'বার করে দেখা যায়, কোথাও মাত্র একবার। তাছাড়া একই দিনের জোয়ার-ভাঁটার সময় ও উচ্চতা সমান নাও হতে পারে।

চন্দ্রের প্রভাব কোথায় নেই

কোন জলাধারের জলকে যদি এমনভাবে আলোড়িত করা যায় যে জল ওঠা-নামা করছে, তাহলে কিনারের উচ্চতা ও নিম্নতা জোয়ার-ভাঁটার মতন সর্বাধিক। জলাধারের মাঝখানে একটি আলোড়নহীন জায়গা থাকবে—দোলকের বেলায় যেমন আমরা দেখতে পাই। দোলকটি দুলিয়ে দিলে দু'ধারে সর্বাধিক উঁচুতে ওঠে, কিন্তু যাতায়াতের পথে মাঝখানে দোলকটি স্থির থাকে। প্রত্যেকটি সমুদ্রের বেসিন বা জলাধারে ঐ রকম একটি আলোড়নহীন জায়গা পাওয়া যায়। তাহিতী দ্বীপে জোয়ার-ভাঁটার সময় সূর্যের সময়ের সঙ্গে বাঁধা মনে হয়, অর্থাৎ চন্দ্রের আকর্ষণের কোন প্রভাবই নেই। আপাত অসম্ভব ঘটনাটির ব্যাখ্যা এইরূপ দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রের আকর্ষণে যে-জলাধারে দোলায়িত আলোড়নটির সৃষ্টি হয় তাহিতী সে জলাধারের আলোড়ন-হীন স্থানটিতে অবস্থিত। অতএব চন্দ্রের আকর্ষণ আর তাহিতীর নিকটবর্তী জলের উপর কার্যকরী হচ্ছে না। কেবলমাত্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার আসে বারোটায়, দিনে ও রাতে, এবং ছটা, সকাল ও সন্ধ্যায় ; এর ব্যতিক্রম খুব কমই। চন্দ্রের আকর্ষণ কার্যকরী হলে প্রত্যহ পঞ্চাশ মিনিট দেরীতে জোয়ার-ভাঁটা হত।

জন্মকাল থেকে বর্তমান দূরত্বে পৌঁছুতে চন্দ্রের লেগেছে প্রায় দু'শো কোটি বছর। যখন অর্ধেক দূরত্বে ছিল তখন আকর্ষণের শক্তি ছিল এমন যে এখনকার তুলনায় প্রায় আট গুণ পরিমাণ জোয়ার-ভাঁটা হত। প্রতিদিন সে কী প্রলয়কাণ্ড! সৌভাগ্যবশত উপকূলবর্তী স্থান গুলিতে তখন বসতি খুবই বিরল ছিল। সে-রকম অবস্থা যদি এখন থাকতো তাহলে মনুষ্য জীবন ত' দূরের কথা মৎস্য ব্যতীত আর কোন প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হত না। জোয়ার-ভাঁটার জোর যেমন কমেছে পৃথিবীর আবর্তনও ধীরগতি হয়েছে। দু'শো কোটি বছর পূর্বে সম্ভবত পৃথিবীর আবর্তন সময় ছিল চার ঘণ্টা মাত্র, ক্রমশ বেড়ে চব্বিশ ঘণ্টা হয়েছে। অতি ধীর গতিতে এই সময় বেড়েই চলেছে।

এর পরিণতি হল চন্দ্রের দূরত্ব বৃদ্ধি। গাণিতিক হিসাবে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে চন্দ্রের প্রদক্ষিণ সময়ও বেড়ে যাবে এবং এমন হতে পারে দিন ও মাসের মধ্যে প্রভেদ থাকবে না। তখন আর জোয়ার-ভাঁটায় চন্দ্রের আকর্ষণ নগণ্য হয়ে পড়বে। এই অবস্থাটি এত শ্লথ গতিতে চলছে যে যখন ঘটবে তখন মানুষের অস্তিত্বই থাকবে কিনা সন্দেহ।

আমরা সময় নিরূপনের জন্য পৃথিবীর অবর্তনকে ভিত্তি করেছি। যে-হেতু সেই আবর্তনকাল বদলে যাচ্ছে, আমাদের সময় রাখার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। নির্ভুল সময় রাখা এখন পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে হচ্ছে। এই ঘড়ির সময় পৃথিবীর আবর্তন-নিরপেক্ষ।

আগেই বলা হয়েছে, জোয়ার-ভাঁটা এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। তা সত্ত্বেও বন্দরে জাহাজ আনাগোনা করতে হলে জোয়ার-ভাঁটার সময়ের সঙ্গে তাল রেখে করতে হয়। এমন সব বন্দর আছে যেখানে জোয়ার-ভাঁটার সময় না জেনে নোঙর করলে জোয়ারের ধাক্কায় বৃহদাকার জাহাজ-ও ভেঙে-চুরে যেতে পারে।

বান

জোয়ার-ভাঁটার আর একটি দিক উল্লেখযোগ্য। নদীর বান-এর কথা আমরা সকলেই জানি। আমাদের গঙ্গায়ও বান আসে। ছোট-ছোট এমনি বান অনেক দেশেই দেখা যায়। জোয়ারের জল যখন সমুদ্র থেকে সংকীর্ণ নদীপথে একটি অথবা কখনও কখনও দু'টি ও তিনটি তরঙ্গরূপে প্রবেশ করে তখন হঠাৎ নদীর জল উত্তাল হয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ডগতিতে প্রবাহিত হয়। নদীতে প্রবেশকালে বালির চড়ায় বাধা পেয়ে জোয়ারের জল থেমে যায়। একাধিক জোয়ারের জল সঞ্চিত হয়ে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে এবং যখন বাধা পেরিয়ে যায় তখন একত্রিত জলরাশি বান-এর আকার ধারণ করে। আমাজন নদীর বান দু'শো মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে। চীনের সিয়েণ্টাং নদীর বান সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিপজ্জনক। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় বান এর

উচ্চতা পঁচিশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে—অন্যসময় আট থেকে এগার ফুট। গতিবেগও ঘণ্টায় পনর-ষোল মাইল।

জোয়ার ভাঁটা ও প্রাণী জগতের সম্পর্ক

জোয়ার-ভাঁটার দিকটাই আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু আরো কতগুলো দিক রয়েছে যা আমাদের অগোচরে ঘটছে। অনেক সমুদ্রপ্রাণী আছে যারা খাদ্য অন্বেষণে প্রায় অপারগ। জোয়ারের জল তাদের খাদ্যসরবরাহ করে। এদের জীবনধারণ জোয়ারের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং জোয়ারের ধ্বংসশক্তির বিরুদ্ধে ও ভাঁটার শুষ্ক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। তার জন্য এদের দেহের গঠন এবং কঠিন আবরণ সহায়করূপে কাজ করে। কোটি কোটি ঝিনুক জাতীয় প্রাণী জোয়ারের জলে ভেসে আসা খাদ্যের-উপর নির্ভরশীল। কেবল তাই নয়, জোয়ারের সঙ্গে তাল রেখে বহু সামুদ্রিক প্রাণী ডিম ছেড়ে দেয়, যার ফলে প্রজননক্রিয়া সহজসাধ্য হতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপের কাছে পালোলা নামী একপ্রকার কেঁচোজাতীয় কীট অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জোয়ারের সময় তাদের সমুদ্রতলের বাসস্থান ছেড়ে উপরে চলে আসে ডিমসুদ্ধ অর্ধেক দেহ নিয়ে। বাকি অর্ধেক নিচেই থেকে যায়। সংখ্যায় এত বেশী যে এ-সময় ওদের রঙ-এ জল-ও রঙীন হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেননা এই সব কীট জোয়ারের খবর পেয়ে উপরে আসে, না চন্দ্রের দ্বারা কোনরকম প্রভাবান্বিত হয়। তা ছাড়া কেন বিশেষ কোন জোয়ারের সময়ই ঘটনাটি ঘটে সে প্রশ্নেরও উত্তর মেলে নি। গ্রানিয়ন নামে একপ্রকার ছোট মাছ ক্যালিফর্নিয়ার সমুদ্রতীরে তাদের প্রজনন ক্রিয়া সমাধান করে। এদের অদ্ভুত অভিযোজন ক্ষমতা দেখলে বিস্ময়ান্বিত হতে হয়। কোটি কোটি স্ত্রী ও পুরুষ মাছ মার্চ থেকে আগস্ট মাসের পূর্ণিমার অব্যবহিত পরে এমন সময়ে তীরে উপস্থিত হবে যাতে ভাঁটার জলে সমুদ্রগর্ভে চলে না যায়, অথচ আর্দ্র বালিতে আটকে থাকে। পরদিন জোয়ার এদের স্পর্শ করতে পারে না, কারণ পূর্ণিমার পর থেকে

জোয়ারের উচ্চতা হ্রাস পেতে থাকে। এমনি ভাবে এক পক্ষকাল ভিজে বালিতে আর্দ্র ও উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ওদের গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোনামাছের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখনও পর্দাছিদ্র করে বেরোয়না, অপেক্ষাকরে অমাবস্যার জোয়ারের জন্য। জোয়ারের জল ধুয়ে নিয়ে যায় সমুদ্রের জলে, ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে পর্দাটি যায় ফেটে, তারপর জলেই বাড়তে থাকে ও পূর্ণ আকার লাভ করে।

কন্‌ভল্যুটা নামে একপ্রকার কীট পাওয়া যায় ক্যালিফর্নিয়ার কাছে চ্যানেল দ্বীপের বালির তীরে, তাদের প্রকৃতি অধিকতর চমকপ্রদ। তার একপ্রকার শেওলাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে ; শেওলা সূর্যকিরণের প্রভাবে শর্করাজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করে। কিন্তু কীট থাকে জলের নিচে বালিতে। যাতে শেওলা সূর্যকিরণ পেতে পারে তারজন্যে কন্‌ভল্যুটা জোয়ারের সঙ্গে উঠে তীরের বালিতে আটকা পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আবার জোয়ার এসে ওদের ধুয়ে নিয়ে যায়, ততক্ষণ শেওলা সৌরশক্তি শুষে নেয়, এবং পরবর্তীকালে শর্করা তৈরী করে। এমনি করে এই সব কীট পরজীবী হয়ে শেওলাকে নিজের পুষ্টির কাজে লাগাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঐ সব কীটকে যদি গবেষণাগারের জলাশয়ে রাখা যায়, তা হলে দেখা যায়, যে ওরা প্রতিদিন দু'বার নিচের বালির বাসা ছেড়ে শেওলাকে আশ্রয় করে উপরে উঠে আসে, যাতে শেওলা সৌরশক্তি শুষে নিতে পারে। তেমনি প্রত্যহ দু'বার বালির বাসায় বসে যায়।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার যে-জীবন কাব্য গড়ে ডঠেছিল, সমুদ্র ছেড়ে গবেষণাগারের জলাশয়ে এসেও তার একটু-ও ছন্দপতন ঘটেনি। প্রাণীজগতের এটি একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ; লক্ষ কিম্বা কোটি বছর বিবর্তনের পরেও কীভাবে ঐ ক্ষুদ্রদেহ কীটের 'মস্তিষ্কে' 'স্মৃতিশক্তি' অটুট রয়ে গেছে কে জানে!

সমুদ্রের তথা পৃথিবীর তাপসাম্য

পৃথিবীর তাপসাম্য বজায় রাখতে সমুদ্রের জল এবং বায়ুমণ্ডল

সর্বাধিক কার্যকরী। সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহ এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজটি সুসম্পন্ন করে। তা না হলে কোথাও চরম ঠাণ্ডা এবং কোথাও তেমনি গরম পরিবেশ রচিত হত। সমুদ্রের জল এবং বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে অবিরাম তাপ বিনিময় চলেছে। বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে সমুদ্রের অবদান অপরিসীম। বায়ুর তাপ ও আর্দ্রতাকে ভিত্তি করে সমুদ্রক্ষেত্রের কতগুলি নির্দিষ্ট জায়গাকে উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ কেন্দ্র রূপে সনাক্ত করা হয়েছে। চাপসৃষ্টির দ্বারা বায়ুপ্রবাহ এবং তৎসংযুক্ত ঘটনাবলী যথা, বারিপাত, ঝড়, তুফান, প্লাবন, খরা ইত্যাদির গতি-প্রকৃতি বহুলাংশে নির্ধারিত হয়।

সমুদ্রের নৈকট্য সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু কখনও কখনও বিপরীত অবস্থার জন্যও দায়ী হতে পারে। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা ও আফ্রিকার কালাহারি মরুভুমির জন্য দায়ী নিকটস্থ সমুদ্র। কিন্তু একটু যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা স্পষ্টরূপে স্বীকার করতে হবে। যদি উপকূল সন্নিকট সমুদ্রস্রোত ঠাণ্ডা হয় এবং পশ্চিম তটভূমি-বায়ুপ্রবাহ পথের মধ্যবর্তী হয়, তা হলেই মরুভূমির মত আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। আটাকামা ও কালাহারির বেলায় এই রকম প্রতিকূল অবস্থাই বর্তমান।

সুমেরু ও কুমেরু মহাসাগরের আবহাওয়ার তারতম্য সমুদ্রের জল ও বায়ুপ্রবাহের গতি প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুমেরু অঞ্চলের চতুর্দিকে সমুদ্র, মাঝখানে মহাদেশীয় ভূমি; কিন্তু কুমেরু অঞ্চল বরফাবৃত মহাদেশীয় ভূমি, তার চতুর্দিকে অতি-শীতল সমুদ্র। কুমেরু অঞ্চলে শেওলা জাতীয় উদ্ভিদই কেবল নজরে পড়ে। স্তন্যপায়ী স্থলবাসী কোন জীবজন্তু নেই, তবে পাখি-মশা-মাছি দেখা যায়। তুলনায় সুমেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা উচ্চপর্যায় উদ্ভিদদের পক্ষে উপযোগী। বস্তুত গ্রীষ্মকাল অল্পস্থায়ী হলেও তারই মধ্যে সেখানে নানা রঙ-এর ফুলের গাছ দেখা যায়। সুমেরু মহাসাগরীয় আবহাওয়ার জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণস্রোত বহুলাংশে দায়ী।

মহাদেশের আবহাওয়ার উপর সমুদ্রের প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অনেকের মনে হয়েছে আবহাওয়ার যে-সব পরিবর্তন, অর্থাৎ কয়েক বছর পরপর যে তাপ ও শৈত্য, কিম্বা প্লাবন ও খরা ঘটছে, তার কারণ-ও কি সমুদ্রের উপর ন্যস্ত করা যায়? এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতৈক্য না হলেও আবহাওয়ার উপর সমুদ্রের প্রভাব যে সুদূর প্রসারী সে-সম্পর্কে কোন মতবিভেদ নেই।

সমুদ্র সম্পদ

পৃথিবীর সর্বাধিক খনিজ সম্পদ সমুদ্রে। এক ঘন মাইল সমুদ্রজলে প্রায় ১৭ কোটি টন লবণ পদার্থ দ্রাব্য অবস্থায় রয়েছে। সমুদ্র জলে এর পরিমাণ হল দশ কোটি কোটি টন অর্থাৎ $১০^{১৫}$। এই পরিমাণ লবণ-দ্রব্যাদি কোটি কোটি বৎসরের সঞ্চয়। বৃষ্টির জলে, নদীর জলে যে-সব দ্রবণীয় লবণ মহাদেশ থেকে একবার সমুদ্রে এসেছিল, সে-সব সমুদ্রেই থেকে গেছে। তা ছাড়া জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে লবণের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। সেই বাষ্প বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রে মাত্র আংশিক ফিরে আসে। তাতে ঘনত্ব বৃদ্ধিই পায়। তার উপর বৃষ্টির জল নদী হয়ে সমুদ্রে যখন আসে তখন আরো দ্রবনীয় লবণ সঙ্গে নিয়ে আসে। সমুদ্র হচ্ছে লবণ সম্পদের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। প্রতি বৎসর প্রায় ৭০০০ ঘন মাইল জল নদী বেয়ে সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং প্রতি মুহূর্তে লবণ-জাতীয় পদার্থ সমুদ্রে সঞ্চিত হচ্ছে।

কিন্তু নদীর জল থেকে সমুদ্রের জল অনেকখানি পৃথক। কেবলমাত্র মাত্রাগত নয়, সংযুতিগতও বটে। যেমন, ক্লোরাইডের অনুপাতে নদীর জলে ক্যালসিয়ামের মাত্রার চার গুণ; অথচ সমুদ্রের জলে ঐ অনুপাত সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ প্রতি এক ভাগ ক্যাল্‌সিয়মের জন্য ৪৬ ভাগ ক্লোরাইড পাওয়া যাবে। সামুদ্রিক প্রাণীরা তাদের দেহ গঠনের কাজে (যেমন, প্রবাল, ঝিনুক, ফোরামিনিফেরা ইত্যাদি) এত বেশী দ্রবনীয় ব্যবহৃত করে যে নদীর জলের তুলনায় ক্যাল্‌সিয়ম খুবই কমে যায়। এই রকম পার্থক্য দ্রবনীয় সিলিকার বেলায় দেখা যায়,

কারণ সিলিকাও ক্যাল্সিয়ম-এর মত সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ গঠনের কার্যে অপরিহার্য। নদীর জলে সিলিকার মাত্রা সমুদ্রের তুলনায় শতকরা ৫০০ ভাগ বেশী।

সাধারণ রকমের লবণ ব্যতীত সমুদ্রের জলে নানাবিধ মৌল আছে যার খোজ মানুষ পেয়েছে সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহ ও দেহাংশ রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। আশ্চর্যের বিষয় যে এই সব মৌলের পরিমাণ এত অল্প যে অভিজ্ঞ রসায়নবিদ্-ও তাদের সমুদ্রজল থেকে উদ্ধার করতে পারে না ; অথচ বিশেষ বিশেষ প্রাণী ও উদ্ভিদ অত অল্প পরিমাণও নিজ নিজ দেহে টেনে নিতে পারে এবং কোন বিশেষ অংশে সঞ্চিত করতে পারে। ভ্যানেডিয়ম যে সমুদ্রের জলে আছে সে তথ্য জানাই যেত না যদি কতকগুলি অতি মন্থরগতি সামুদ্রিক প্রাণী তাদেব দেহে এই মৌলটি সঞ্চিত করে না রাখত। অতি অল্প মাত্রায় হলেও কোবাল্ট্, নিকেল্ ও তামা চিংড়ী এবং ঝিনুক জাতীয় ও কঠিন খোসাযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীর পুষ্টি কার্যে অপরিহার্য। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর রক্তে যেমন লোহা কাজ করে, চিংড়ী জাতীয় প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে তেমনি তামা।

অনেক মাছের কাঁটায় পাওয়া গেছে দস্তা, তামা টিন, নিকেল্ ও রুপো। সমুদ্রের জলে কয়েকটি ধাতু ও মৌলের মোট পরিমাণ এইরূপ: তামা—১৫০০ কোটি টন ; বোরন—৭০ হাজার কোটি টন ; ম্যাঙ্গানিজ—১৫০০ কোটি টন ; য়ুরেনিয়াম—২০০ কোটি টন ; রুপো—৫০ কোটি টন ; সোনা—এক কোটি টন। কিন্তু সমুদ্রের জল পরিমাণে অতবেশী সত্ত্বেও যেমন পানযোগ্য নয়, অতসব দামী দামী ধাতু অথবা মৌল এত অধিক পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও দুর্লভ। উদ্ধার কার্য প্রায় অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। তাছাড়া উদ্ধারকার্যে আইনগত প্রশ্নও রয়েছে। খুব সম্ভবত সমুদ্রসম্পদ আহরণকার্য রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা না হলে আন্তর্জাতিক বিবাদ এড়ানো অসম্ভব।

সমুদ্রের জল বিশ্লেষণ করে প্রায় ৭৫টি মৌলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—পৃথিবীতে আছে ৯২টি মৌল। এই ৭৫টির মধ্যে মাত্র ১১টি মৌল ৯৯·৯৯৭ শতাংশ দাবি করে। মৌলগুলির নাম : সোডিয়াম পটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়ম, ক্যাল্‌সিয়াম, ষ্ট্রন্‌সিয়ম, সালফার (সালফেট), ক্লোরিন (ক্লোরাইড্), ব্রোমিন (ব্রোমাইড), ফ্লুরিন (ফ্লুরাইড), কার্বন (কার্বনডায়ক্সাইড্) এবং বোরন (বোরিক এসিড্)। লবণগুলির আনুপাতিক সম্পর্ক সব সমুদ্রেই প্রায় সমান। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বিরাট সমুদ্রজলে কী পদ্ধতিতে এই আনুপাতিক সমতা কোটি কোটি বছর ধরে বজায় রয়েছে।

আরও আশ্চর্য এই যে এত অধিক পরিমাণ লবণের মধ্যে বাস করেও উদ্ভিদ ও প্রাণীরা দেহমধ্যে অল্পই গ্রহণ করে। অর্থাৎ এদের দেহে এমন সব উপায় ও পদ্ধতি বর্তমান যার দ্বারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ একেবারেই দেহকোষে প্রবেশ করতে পারে না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রত্যেক স্থলপ্রাণীর দেহকোষে যে লবণ যৌগ রয়েছে তার সংযুতি সমুদ্রপ্রাণীর প্রায় সমান। এই তথ্যের ভিত্তিতে স্থলপ্রাণীর উদ্ভব যে সমুদ্র থেকে এই তত্ত্বটি সমর্থন লাভ করে।

সোনা সম্পর্কে স্থলবাসীর মত সামুদ্রিক প্রাণীর কোন আগ্রহ দেখা যায় না। হিসাব করে দেখা হয়েছে যে সমুদ্রের জলের সবটুকু সোনা যদি উদ্ধার করা যেতো তা হলে পৃথিবীবাসী সকলেই লক্ষপতি হতে পারতো। কিন্তু আফশোস এই যে উদ্ধার কার্য দামে পোষাবে না। সহজ ও অল্পব্যয়ে উদ্ধার কার্যের পিছনে লেগে থাকলে পাগল হওয়া ছাড়া আর কোন সম্ভাবনা নেই।

ভ্যানেডিয়ম, কোবাল্ট, নিকেল্ হল মৌলধাতু ; সমুদ্রের জলে তাদের টের পাওয়া যেত না যদি সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদেরা বিজ্ঞানীদের সাহায্য না করত। তেমনি মৌল অধাতুর মধ্যে রয়েছে আয়োডিন ও ব্রোমিন। এদের একমাত্র উৎস হল সমুদ্রের জল। আয়োডিন প্রায় সব সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেহে কম-বেশী পাওয়া যায়। সমুদ্র-

জল থেকে লবণ (খাদ্যেব্যবহার্য) উদ্ধারে পর যে ঘন লবণাক্ত দ্রবণ পড়ে থাকে তা থেকে ব্রোমিন ও ম্যাগনেসিয়াম উদ্ধার করা যায় এছাড়াও সমুদ্র থেকে উদ্ভূত লবণহ্রদ বা লবণস্তূপ থেকে বহুপ্রকার মৌল উদ্ধার হচ্ছে বাণিজ্যিক প্রযুক্তি পদ্ধতিতে।

সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহাবশেষ থেকেই যে পেট্রোলিয়ম-এর উৎপত্তি হয়েছে এই তত্ত্ব এখন মেনে নেওয়া হয়েছে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র অজৈব পদার্থেরই উৎস নয়, জৈব পদার্থ সরবরাহ করাও সমুদ্রের অন্যতম অবদান। মহাসাগরীয় মহীঢালগুলি এইজন্য তন্ন তন্ন করে সন্ধান করা হচ্ছে—উদ্দেশ্য আধুনিক জীবনধারণের অন্যতম অপরিহার্য পদার্থ পেট্রোলিয়ম আবিষ্কার করা।

সমুদ্রের জলে হাজার হাজার প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু থেকে আরম্ভ করে একশো টন তিমি পর্যন্ত। কতরকম যে প্রাণী ও মাছ আছে তার সীমা নেই। মানুষ নানাভাবে এই সামুদ্রিক সম্পদকে কাজে লাগাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সামুদ্রিক শেওলা এবং ফাইটোপ্ল্যাঙ্ক্‌টন বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ পৃথিবীতে সৌরশক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যাদির তিন-চতুর্থাংশ হল এদের দিয়ে তৈরী। জাপানে, হাওয়াইতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কতগুলো দ্বীপপুঞ্জ সামুদ্রিক শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের খাদ্যরূপে ব্যবহার অনেককাল থেকে প্রচলিত। ফসল বৃদ্ধির জন্য এদের চাষেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। 'নরী' নামে এক জাতীয় লাল রঙ-এর শেওলা সমুদ্রোপকূলে চাষ করা হয় ; এটি জাপানে মানুষের পক্ষে পুষ্টিকারী খাদ্য হিসাবে গণ্য। প্রতি ১০০ গ্রাম 'নরী-তে প্রোটিন থাকে ৩৭ গ্রাম, ০'৭ গ্রাম চর্বি, ৪৪ গ্রাম শর্করাজাতীয় পদার্থ ; এছাড়া আছে খনিজ লবণ, ভিটামিন এ, বি, ও সি। জাপানে ৬০,০০০ হেক্‌টরের অধিক সমুদ্রজলে 'নরী' চাষ করা হচ্ছে। কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ান-ও 'নরী' চাষে অভিজ্ঞ।

শেওলা ও ফাইটোপ্ল্যাঙ্ক্‌টন কেবল মানুষেরই খাদ্য নয়। আগেই বলা হয়েছে যে এরা খাদ্যশৃঙ্খল অন্তর্ভুক্ত। ছোট ছোট মাছ এদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আর বড়-রা খায় ছোট মাছদের। সুতরাং শেওলার চাষ করে সেখানে বড় বড় মাছের আবাদও সম্ভব।

সমুদ্র সম্পর্কিত আইন

সমুদ্র সম্পদের বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র দেখে সকল দেশই এগিয়ে আসছে সম্পদ উদ্ধার করতে এবং কাজে লাগাতে। বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক বিদ্যার সাহায্য উদ্ধার কার্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও অভাববোধ পৃথিবীর সব সম্পদই প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। তাতে যে পরিবেশ বৈষম্য দেখা দিয়েছে তাকে সামলানো প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। সমুদ্রের উপর পড়েছে এখন মানুষের সর্বগ্রাসী সর্বনাশী দৃষ্টি। সমুদ্রে জাহাজ চলাচল নিয়ে অনেক স্বাধীনতা ছিল। এখনও আছে। কিন্তু তীর থেকে সমুদ্রের কতদূর পর্যন্ত স্থলভাগ বলে স্বীকৃত হবে সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য দূরত্ব নির্ধারিত হয়েছিল কামানের পাল্লার সমান অর্থাৎ প্রায় ৫ কিমি। এখন ৩২০ কিমি দূরত্ব এবং ১৮৮৬ মি গভীর জলের আয়তনকে সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত রাষ্ট্রের স্থলভাগের অংশরূপে গণ্য করা হচ্ছে। সমুদ্র সম্পদ আহরণের জন্য এইরূপ সীমা নির্দেশ করা অত্যাবশ্যক। কোন আগ্রাসী রাষ্ট্রকে প্রতিরোধকল্পে দূরত্ব রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটি বিষয়ে সমুদ্রের উপর আধিপত্য সংকীর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি, তৈল এবং তেজস্ক্রিয় পর্দার্থ সমুদ্রের নিজ এলাকার মধ্যে ছাড়িয়ে দেবার স্বাধীনতা যদি কোন রাষ্ট্র দাবি করে, তা হলে যে-সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে তা কল্পনাও করা যায় না। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উন্নত কোন রাষ্ট্রসমুদ্র সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করতে থাকে তা হলে অনুন্নত রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে বাধ্য। সুতরাং এই বিষয়ে একটি সর্বসম্মতিপূর্ণ চুক্তি প্রণয়ন অত্যাবশক হয়ে পড়েছে। সমুদ্র সম্পর্কিত আইনের অন্যান্য খুঁটিখাটি ব্যাপারও রয়েছে সে-নিয়ে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

উপসংহার

সমুদ্র নিজেই এক বিস্ময়ের সমুদ্র! অনেক বলার পরেও সমুদ্র অচেনা থেকে যায়। বিজ্ঞাম ও কল্পনা—দুটি ডানা নিয়ে মানুষ সমুদ্রের সামনে দাঁড়ায়, তবু সামনে গভীর অতল অনাবিষ্কৃত জলভূমি!

প্রযুক্তি

সবুজ বিপ্লব

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগে কৃষিক্ষেত্রে যে-বিপ্লব ঘটেছিল, সেই বীজ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একদল তরুণ কৃষিবিজ্ঞানী চার দশকের মাঝামাঝি চললো মেক্সিকোতে। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস অনুন্নত মেক্সিকোতেও ঐ একই বীজ বিপ্লব সৃষ্টি করবে। অক্লান্ত গবেষণার ফলে তাঁরা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। প্রায় পঁচিশ বছরের মধ্যে মেক্সিকো অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার করে গম ও ভুট্টা উৎপাদনে স্বনির্ভর তো হলই, উপরন্তু রপ্তানি করতে শুরু করে। উন্নতজাতের বীজ বিকাশের অপূর্ব ধারা বহন করে এগিয়ে চলে সমৃদ্ধির পথে। এই বীজের সাহায্যে আর উপযুক্ত পরিমাণ জল ও সার প্রয়োগে ফলন দ্বিগুণ করা মোটেই কঠিন নয়। মেক্সিকো সিটির গবেষণাগারের সাফল্যের মূলে ছিল রকফেলার ফাউণ্ডেশনের আর্থিক সহায়তা ও পরিকল্পনা। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রকফেলার ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের যুগ্মপ্রচেষ্টায় গড়ে উঠল ষষ্ঠ দশকের গোড়ায় ফিলিপিনস্-এর লাস্ বানস-এ আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণাসংস্থা। তাঁদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে উৎপন্ন হল এক অত্যাশ্চার্য ধানের বীজ। নাম দেওয়া হল আই আর-৮।

নতুনের ঝুঁকি

কোন নতুন জাতের বীজ আমদানি করার ঝুঁকি আছে অনেক রকম। মেক্সিকো কিংবা ফিলিপিনস্-এ বীজ অধিক ফলনশীল হলেও নতুন পরিবেশে ফলন সুনিশ্চিত নয়। তাকে যাচাই করে নেওয়া দরকার। এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে যে নতুন বীজ ব্যবহার করে ফলন আশানরূপ তো হল-ই না বরং অনেক ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণে

সবটাই বিনষ্ট হল। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশগুলি যখন নতুন বীজ আমদানির কথা চিন্তা করছিল তখন এই আশঙ্কার কথা মানসিক বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের পরামর্শে ১৯৬৫ সালে ভারতবর্ষ ২৫০ টন বীজ আমদানি করে এবং পাকিস্তান করে ৩৫০ টন। প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে আশাতীত সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬৬ সালে ভারত ১৮০০০ টন এবং পাকিস্তান ৪২০০০ টন গমের বীজ আমদানি করল। অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির মধ্যেও প্রভূত সাড়া জাগে। ১৯৬৯ সালের মধ্যে একমাত্র এশিয়ায় গম ও ধানের বীজ ছড়িয়ে পড়ল প্রায় সাড়ে তিন কোটি একরে, অর্থাৎ চার বছরে বেড়ে গেল প্রায় হাজার গুণ। সঙ্গে সঙ্গে ফলনের মোট পরিমাণ বেড়ে গেল অবিশ্বাস্য হারে। প্রতি একরে ফলন হল দ্বিগুণ কিম্বা তারও বেশী। এই সাফল্যকেই উচ্ছ্বাসভরে আখ্যা দেওয়া হল 'সবুজ বিপ্লব' বলে। বিপ্লবের ঢেউ কম বেশি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ গবেষণার পরিধিও বিস্তৃত হল—ভুট্টা, জওয়ার, বাজরা, ডালজাতীয় শস্য, তুলা, ইক্ষু ইত্যাদির ক্ষেত্রে। স্থাপিত হল কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যে রাজ্যে গড়ে উঠল কৃষি গবেষণাগার; সম্প্রসারণ সংস্থার সহায়তায় অধিক ফলনশীল কৃষিকর্মের বার্তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হল, নির্দিষ্ট হল হাতে-কলমে চাক্ষুষ পরীক্ষার কাজ। বিপ্লব, কেবল যে মাঠে হয়েছে তাই নয়, তার ঢেউ লাগলো কৃষকদের মনেও। এর মূল্যায়ন সহজ না হলেও মূল্য তো কম নয়!

মূল্যায়ণ

এই যে শস্যের ফলন দ্বিগুণ হল, উৎপাদন আশাতীত বৃদ্ধি পেল তার জন্য কী মূল্য দিতে হল তার হিসাব চাওয়া স্বাভাবিক। উন্নত জাতের বীজ হলেই উৎপাদন বাড়ে না—তার সঙ্গে চাই পরিমিত সেচের জল, সার এবং কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। এদের পরিমাণও কম নয়, মূল্যও যথেষ্ট। তা ছাড়া ভাবতে হবে এদের

লভ্যতা। অন্যদিকে সবার ওপর দরকার জলের নিয়ন্ত্রণ। বর্ষার এককালীন অতিরিক্ত জল কিংবা খরার স্বল্প জল• উন্নতজাতের শস্য উৎপাদনের পরিপন্থী। সুনিয়ন্ত্রিত জল পেতে হলে সেচব্যবস্থা প্রয়োজন, আবার সেও ব্যয়সাধ্য। রাসায়নিক সার অনায়াসে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও মূল্যবহন করা সর্বস্তরের কৃষকের পক্ষে সম্ভব নয়। উন্নত জাতের শস্যাদির রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা এত কম যে রোগনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ ছাড়া ফলন একেবারেই সম্ভব নয়। এইসব রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূল্য ও লভ্যতা শেষ অবধি উন্নত জাতের শস্য উৎপাদনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবেশ দূষণ

মূল্য ও লভ্যতা ছাড়া আরো একটি দিক রয়েছে যেটি সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে নজর দেওয়া হয় নি। সেটি হল রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহারে মৃত্তিকা ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন। বছরের পর বছর যেমন তেমন ভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদি ব্যবহারে মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেতে বাধ্য। জল ও আবহাওয়া দূষিত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রকট। এ ছাড়া অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে বহু বছর ধরে সেচের জল ব্যবহার করে লবণের আক্রমণে বহু কৃষিযোগ্য জমির উর্বরতা বিনষ্ট হয়েছে।

কৃষকদের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি

আরও একটি দিকে অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু উচ্চফলনশীল জাতের বীজের সঙ্গে সেচ, সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার অনিবার্যকারণে ব্যয়বহুল,'সেহেতু কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন কৃষকরাই এই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ নিতে পারল, কিন্তু গরিব কৃষকদের পক্ষে এই মূল্য বহন করা সাধ্যের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে অবস্থাপন্ন কৃষকরাই লাভবান হতে থাকে, তুলনায় গরিব কৃষকরা পিছিয়ে পড়ে। মোটকথা সবুজ বিপ্লব সর্বাত্মক নয়, সর্বজনের হিতকরও নয়। অতএব বাস্তব দৃষ্টিতে এটিকে বিপ্লব বলা চলে না। এই

পরিস্থিতির পরিণতি হল যে, যেখানে প্রচুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে জল পাওয়া যাবে, যথেষ্ট পরিমাণ সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদি সহজলভ্য হবে, কেবল সেখানেই কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদনে বিপ্লব সম্ভব। নবপ্রযুক্তিবিদ্যার অবদান স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু সহজ সত্য কথা হল জল, সার ইত্যাদি অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক বস্তু সহজলভ্য নয়, এরা ব্যয়সাধ্যও। এই কারণেই ভারতবর্ষে গড়ে এখন পর্যন্ত মাত্র পঁচিশ শতাংশ কৃষিজমিতে নব প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন সম্ভব হয়েছে আর বেশীব ভাগ ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত ধনী এবং বড়ো কৃষকরাই লাভবান হয়েছে। সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের দৃষ্টান্ত হল পাঞ্জাব ও হরিয়ানা—সেখানেও সর্বস্তরের কৃষক সুপারিশ মোতাবেক সার প্রয়োগ করতে পারে না, সেখানেও অন্তত দশ শতাংশ দরিদ্র কৃষক রয়েছে যারা সবুজ বিপ্লব থেকে এখনো বহু দূরে।

গত তিরিশ বছরে সামগ্রিক উৎপাদন বেড়েছে প্রায় আড়াই গুণ ; সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদি ব্যবহারও এই অনুপাতে বেড়েছে ; কিন্তু এখনও জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশের বেশী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে, দুবেলা খেতে পায় না। এই হল বিপ্লবের নমুনা। অন্যদিকে দেখতে পাই যে, যেখানে জীবনযাপন সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক সেই গ্রামে কৃষিজীবীর সংখ্যা কমছে এবং ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাব তুলনা করলে দেখা যায় যে ১০ বছরে কৃষিজীবীর সংখ্যা ৪৪.৬ লক্ষ থেকে ৩৯.৬ লক্ষ হয়েছে আর ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা ১৭.৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩২.৭ লক্ষে পৌঁছেছে। তেমনি বেড়েছে বেকার মানুষের সংখ্যা। গ্রামে আংশিক এবং স্থানীয় কৃষিসম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরে বিস্তৃতি ঘটেছে ; ফলে গ্রাম-দেশের বেকার লোক শহরের বস্তী অঞ্চলে দিনমজুর ও দরিদ্রের সংখ্যা দিয়েছে বাড়িয়ে। নতুন নতুন আকর্ষণীয় পণ্যদ্রব্য আমদানি করে গ্রামের সম্পদ শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এমনি করেই গ্রামের আর্থিক অবনতি ঘটছে। এও বিপ্লব বটে, তবে অন্য ধরনের।

এসব সত্ত্বেও তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবে'র আংশিক সাফল্য কৃষি-কর্মে আলোড়ন এনে দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়েছে উন্নত মানের কৃষি গবেষণার দিকে। সরকারী সহানুভূতি ও সহায়তার যোগে গড়ে উঠল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি সম্পর্কিত গবেষণাগার। মেক্সিকো এবং ফিলিপিনস থেকে পাওয়া বীজের অনুকরণে তৈরী হচ্ছে নানা জাতের স্থান ও কালোপযোগী বীজ। কিন্তু তাতে নবপ্রযুক্তিবিদ্যার ত্রুটি ও অসুবিধাগুলি দূর হল না। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দুর্দশা ঘুচলো না। ব্যয়সাধ্য সবুজ বিপ্লব একই গ্রামীণ পরিবেশে যে-ব্যবধান সৃষ্টি করল, তা হয়ে দাঁড়ালো সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের অন্তরায়।

বাঁধ তৈরী করে পূর্ণমাত্রায় সেচের জলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে দেখা গেল এই পদ্ধতি উপযুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তারও সীমা আছে। বাঁধের জল ধরে রাখা, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা ব্যয়বহুল। ব্যয়ের অনুপাতে ফললাভ আশানুরূপ হয় নি, বিশেষ করে বলা যায় আমাদের দেশের ছোট-বড়ো বাঁধ প্রকল্পগুলির বেলায়। তা ছাড়া যেখানেই সেচব্যবস্থা চালু হয়েছে সেখানেই যদৃচ্ছ জল ব্যবহার করার ফলে ও জল নিষ্কাশনের অভাবে, জমি ক্রমশ লবণাক্ত এবং পরিশেষে ক্ষারযুক্ত হয়ে কৃষিকর্মের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েছে। এমন কি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় সবুজ বিপ্লবের এই পরিণতি এক ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। জমির এই অপঘাত থেকে মুক্তি দিতে বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে বটে কিন্তু সমস্যার সমাধান সহজ নয়; কঠিন, বেশ কঠিন!

বিকল্প ভাবনা

যেসব জায়গায় কৃষিকর্ম বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল, সেখানে নবপ্রযুক্তিবিদ্যা কাজের নয়। অতএব সেখানে বিকল্প প্রযুক্তিবিদ্যার কথা ভাবতে হবে। সে সম্পর্কে গবেষণা চলছে এবং বিজ্ঞানীরা অন্যজাতের বীজ তৈরীর চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন—কিছু সফলতাও লাভ

করেছেন। যতটুকু জলই যে-সময় পাওয়া যায় তাকে উপযুক্তরূপে ব্যবহারে উৎপাদনে বিপ্লব আনা যাবে না, তবে উৎপাদনের অনিশ্চয়তা কমানো যাবে। সাধারণ কৃষকদের পক্ষে এইটুকু নিশ্চয়তা অনেক বেশী আশার আকাঙ্ক্ষার !

নবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তক নর্ম্যান বোর্লগ বলেন যে, এই ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা সর্বস্তরের কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা কম। তার প্রয়োজনও নেই। খাদ্য সমস্যা যে-দেশে অত্যন্ত প্রকট সে-দেশে এই প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রাথমিক বিপর্যয় এড়ান যেতে পারে। পাঁচ-সাত বছর বাদে উচ্চফলনশীল বীজ কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বর্জন করা উচিত ; তারপর উন্নতজাতের মধ্য-ফলনশীল বীজের প্রচলন সুফল আনবে।

প্রাচুর্যের সমস্যা

আরো একটি দিকে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চফলনশীল শস্য বিস্তারের ফলে উৎপাদন যদি প্রয়োজনের তুলনায় দ্রুততর হারে বাড়তে থাকে তা হল 'প্রাচুর্যের সমস্যা' দেখা দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন বিশ্বের নানা দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে আসছে। এটি সম্ভব হয়েছে নবপ্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে। কিন্তু সম্প্রতি অনেক দেশই উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে, অতএব যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ততখানি দরকার হচ্ছে না। এই অবস্থায় সেখানকার কৃষকরা যাতে অধিক উৎপাদন না করে তার জন্য সরকারী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা এই নির্দেশ মান্য করবে তারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে। প্রাচুর্যের সমস্যা সমাধানের এ এক অভিনব উপায় !

আমাদের দেশে দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রাচুর্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ দরিদ্রের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত কম ; তাদের সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে অথচ খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত থাকে, তা হলে আপাত প্রাচুর্য আর তার সৃষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হব। সে-অবস্থায় বুভুক্ষু মানুষের প্রয়োজন উপেক্ষা করে রপ্তানির কথা

ভাবতে হবে। এই ভাবনা মোটেই অমূলক নয়। এরকম ঘটনা অতীতে ঘটেছে। বর্তমানেও ঘটে চলেছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যিক সংস্থা

কৃষিকর্মে নবপ্রযুক্তিবিদ্যার এই অবদান আপাতদৃষ্টিতে এতই চমকপ্রদ যে উন্নয়নকামী দেশগুলি যে-কোন উপায়েই তাকে কার্যকরী করতে আগ্রহী। তাৎক্ষণিক চাহিদার চাপে ভবিষ্যৎ সমস্যাদির কথা মনে স্থান পায় না। আবার এই সব সমস্যাকে অকিঞ্চিৎকর আর ঝাপসা করে তোলার জন্য আছে কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থা। এদের কাজ হল নবপ্রযুক্তিবিদ্যার জয়গান করা ; সঙ্গে সঙ্গে বীজ, সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদি ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি-সম্ভার অবস্থাপন্ন কৃষকদের সামনে বিশেষ করে তুলে ধরা। এই কাজে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহয্যে চাপ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও রয়েছে।

ভালো মন্দের বিচার বিবেচনা

তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই, উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকরী করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতেই হবে। তাই বলে নির্বিচারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনুকরণ করা সমর্থনযোগ্য নয়। সেইজন্য কৃষিকর্মে সবুজ বিপ্লবের ভালো-মন্দ বিচার করে ঠিক করা উচিত কোন পথ বাঞ্ছনীয়, আর কোনটা বা বর্জনীয়। আপাতদৃষ্টিতে যে-পথ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে সেই পথ ও পদ্ধতি গ্রহণীয় নাও হতে পারে। উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা শক্তি ও মূলধন বাঁচাতে পারে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে, বিলাস দ্রব্যের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরী করে, পরিবেশ দূষণ বন্ধ করতে পারে এবং পারে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে। উপযোগিতার কষ্টিপাথরে এদের যাচাই করে দেখলে ভবিষ্যৎ সমস্যার পরিমাণ বহুলাংশে কমে যাবে। তাই বলে অযথা আশঙ্কা পোষণ করা উচিত হবে না। কোন পথে চলা যাবে তার সঠিক হিসাবের পদ্ধতি জানা নেই। তবু জানা যায় আতঙ্ক সঞ্চারের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী

অতীতে করা হয়েছে, পরিশেষে তা ভুলও প্রমাণিত হয়েছে। তবু তো ভবিষ্যদ্‌বাণী করার উৎসাহ কমেনি। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সমস্যা সমাধান করার জন্য সদাই প্রস্তুত। এবং এক সমস্যা সমাধানের পথ বেয়ে অন্য সমস্যার উদয় হওয়া অসম্ভব তো নয়। অতএব অবিরাম সংগ্রামের জন্য বিজ্ঞানীকে সতর্ক থাকতে হবে। বিজ্ঞানের সহায়তায় বিপ্লব যদি বা ঘটে তাতেও এই সংগ্রামের সমাপ্তি নেই। সবুজ বিপ্লবের ভালো মন্দ বিচার করতে গিয়ে চিরপ্রবহমান বিজ্ঞানকে আরো একবার জানা গেল। এও তো এক শিক্ষা।

প্রযুক্তি ঃ

মৃত্তিকা বিজ্ঞান ঃ কিছু কথা

চলতি ভাষায় মৃত্তিকাকে মাটি বলা হয়। মাটি এতই সুলভ এতই কাছের বস্তু যে মনে হয় পরিচয় অনাবশ্যক। মাটি বলতে সাধারণত অবহেলা এবং অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পায়। 'মা'টি বললে অন্য অর্থ হয়। সর্বংসহা পৃথিবী, যেমন মা।···মাটি নানাবিধ উৎপীড়ন সহ্য করেও যথাসাধ্য উপকার করতে কার্পণ্য করে না।

মৃত্তিকা অনেক কাজে লাগে। প্রধানত কৃষিকার্যে; তা ছাড়া গৃহ ও রাস্তা-নির্মাণে, কাগজশিল্পে, তৈল ইত্যাদি পরিশ্রুত করতে, খনিজ তৈল উদ্ধারকার্যে, চীনামাটিজাত শিল্পে, ময়লা ও বীজাণু ধ্বংসে। যে বস্তুটির এত রকম কাজে ব্যবহার তার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে।

মৃত্তিকা একটি জটিল বস্তু নানাবিধ উপাদানের সমষ্টি। মৃত্তিকা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সুবিন্যস্ত ভিত্তি রচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে এই জটিল মৃত্তিকার গুণাগুণ যেমন জানা গিয়েছে তেমনি কী কী উপাদানে গুণাধর্ম নির্ধারিত হয় অথবা কী কী বিক্রিয়ার সাহায্যে, গুণাধর্মের সুযোগ নিয়ে কোন কোন প্রয়োগ শিল্প রচনা করা সম্ভব তাও জানা গিয়েছে।

পৃথিবী পৃষ্ঠের ধুলা-বালি-কাদা-ময়লা ইত্যাদিকে সাধারণতঃ মাটি বা মৃত্তিকা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতে হলে মৃত্তিকার একটি সংজ্ঞা দরকার। এই জন্য মৃত্তিকা কি এবং কী থেকে তার উৎপত্তি জানা প্রয়োজন। রাসায়নিক দৃষ্টিতে মৃত্তিকা একটি জটিল সিলিকেট সমষ্টি। এই সিলিকেটগুলির আয়তন সাধারণ অণুর তুলনায় বিরাট; অসংখ্য অণুর সহযোগে এক

একটি বৃহৎ অণুর সৃষ্টি এখানে হয়েছে ;—এত বড় যে চোখেও ধরা পড়ে। এইজন্য মৃত্তিকা সিলিকেট অণুসমষ্টিকে কণা বলা যায়। এই কণাগুলির ব্যাস ∠2 মি. মি. ধরা হয়। 2 মি. মি এর থেকে বড় কণাগুলির মধ্যে মৃত্তিকার সাধারণভাবে জানা কোন গুণই পাওয়া যায় না। নানা আয়তনের কণাসমষ্টির রাসায়নিক গঠন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন।

মৃত্তিকার উৎপত্তি হল শিলা থেকে। শিলা নানা ধরনের। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে এই সব শিলাশ্রেণী তাপ, শৈত্য, জল বৃষ্টি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছে এবং নিয়ত রূপান্তরিত হচ্ছে। বছরের পর বছর রাসায়নিক এবং ভৌত বিক্রিয়াদির ফলে কঠিন শিলাপৃষ্ঠে একটি অপেক্ষাকৃত নরম এবং কণাবিশিষ্ট আস্তরণ তৈরী হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে আস্তরণটি কঠিন শিলা থেকেই উদ্ভূত এবং হয়তো তাপশৈত্য জলবৃষ্টির আক্রমণে কণায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে অণুকণাটির সমষ্টি এবং চূর্ণীকৃত শিলার মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়ে পড়ে। একটি সামান্য পরীক্ষার সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে। দুটি কাঁসার পাত্রের (4·5 সে. মি ব্যাস ও 1 সে. মি. উঁচু) তলদেশে কতগুলি ছিদ্র করা হল। সচ্ছিদ্র তলদেশে দু-খানি ব্লটিং পেপার বা চোষকাগজ মাপমত বসিয়ে ∠2 মি. মি. শুষ্ক মৃত্তিকা ও চূর্ণীকৃত শিলা দিয়ে যথাক্রমে ভরাট করে দেওয়া হল। দুটি পাত্রকেই একসাথে একটি বড় পাত্রে রাখা হল যাতে তলদেশ না ঠেকে যায়। এরপর এমন পরিমাণ জল ঢেলে দেওয়া হল যাতে মাঝের মৃত্তিকা শিলাচূর্ণ ভরা পাত্র দুটির তলদেশ 0·5 সে. মি. পর্যন্ত ডুবে যায়। সবটাই আর একটি ঢাকনা দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হল যাতে বাষ্পাকারে জল দ্রুত উড়ে না যায়। 24 ঘণ্টা পরে দেখা যাবে যে যে পাত্রটিতে মৃত্তিকা রাখা আছে তা কিছুটা ফুলে উঠেছে, কিন্তু দ্বিতীয় পাত্রের শিলাচূর্ণ প্রায় একই অবস্থায় আছে

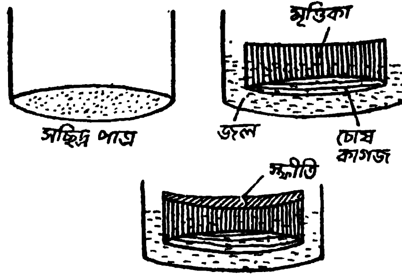
কিম্বা সামান্য চুপ্‌সে গেছে। জলের সংস্পর্শে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নজর করলে দেখা যেত যে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে মৃত্তিকা জল টেনে নিচ্ছে। যদি এই অবস্থায় পাত্র দুটি তুলে এনে কিছুটা মৃত্তিকা এবং শিলাচূর্ণ সরিয়ে জল ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে শিলাচূর্ণ ভরা পাত্রটির তলদেশ থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই জল বেরিয়ে আসে। কিন্তু মৃত্তিকা ভরা পাত্রটি থেকে জল একেবারেই বেরোচ্ছে না কিম্বা অতি মন্থর গতিতে সামান্য বেরোচ্ছে (চিত্র 1)। এই ছোট পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিলাচূর্ণ এবং মৃত্তিকা একই বস্তু নয়। অর্থাৎ শিলাখণ্ড চূর্ণ করলেই মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয় না। এমন কি আরও সূক্ষ্ম কণার পরিণত করলেও শিলাচূর্ণ মৃত্তিকার গুণ পায় না। মৃত্তিকা যেমন জল টানতে পারে, তেমনি জল ধরেও রাখতে পারে। জলের প্রতি আকর্ষণ ও জলেব সঙ্গে বন্ধন মৃত্তিকার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এইজন্যই কৃষি ও নানাবিধ প্রয়োগকার্যে মৃত্তিকার উপযোগিতা অতুলনীয়।

শিলা থেকে রূপান্তরিত হয়েই যে মৃত্তিকার উৎপত্তি ঘটেছে সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। অন্যদিকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে শিলা ও মৃত্তিকার মধ্যে বিভেদও ধরা যায়।

কয়েকটি উপাদানের পরিমাণগত তারতম্য সহজেই চোখে পড়ে (প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ সারণী দ্রষ্টব্য) যেমন, শিলার তুলনায় সিলিকার পরিমাণ মৃত্তিকায় কিছু বেশী, কিন্তু এলুমিনিয়াম ও আয়রণ অক্সাইড মৃত্তিকায় কম। অন্যদিকে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের পরিমাণ শিলার অনেক বেশী। মৃত্তিকায় বেশী পরিমাণ জলের অবস্থিতিটি বিশেষ লক্ষণীয়। আগে জানানো পরীক্ষায় এই তথ্যটিই বোঝানো হয়েছিল। 2নং ও 4নং সারণী দুটি তুলনা করে দেখলে পার্থক্য ধরা পড়ে। দ্বিতীয়টিতে মৃত্তিকার জৈব পদার্থের প্রাধান্য, চতুর্থটিতে বিযোজন চরম পর্যায়ে হাজির।

আবহাওয়া বা গড় বারিপাত ও তাপাঙ্ক, উদ্ভিজ্জ পদার্থ, জীবাণু-

সমষ্টি ও কাল—এই পাঁচটি হলো শিলার মৃত্তিকায় রূপান্তরের প্রধান কারণ। এই সব কারণের তারতম্যই মৃত্তিকার জটিলতা এবং পার্থক্যের জন্য দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কী কী রাসায়নিক ও ভৌত ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করবে। এই ক্রিয়াগুলি ঘটে অতি মন্থর গতিতে। যুগ যুগ ধরে এই সব বিক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়। একটি মানুষের জীবদ্দশায় হয়তো এই রূপান্তর ধরা পড়বে না। যেহেতু এই রূপান্তর নিয়ত চলমান সেইজন্য নিত্য পরিবর্তন ঘটে চলে; তবু আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় না। সময় বা কালও এইজন্য অন্যতম কারণরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে। নানা তথ্য থেকে অনুমান করা যায়,



চিত্র 1

যে এক মিলিমিটার মৃত্তিকাস্তর প্রস্তুত হতে—কালের প্রভাবে—প্রায় শতাধিক বৎসর লাগে। সুতরাং কিভাবে শিলা মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হয়েছে তার পারম্পর্য সম্পর্কে অংশত কল্পনা এবং অংশত পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করতে হবে। কল্পনার ভিত্তি হলো শিলাপৃষ্ঠে মৃত্তিকা কিম্বা মৃত্তিকাসম পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যদি এমন একটি জায়গার মৃত্তিকা পরীক্ষা করা হয় যেখানে বারিপাত বা তাপমাত্রা বেশী নয় তা হলে মৃত্তিকার স্তর ভেদ করে অনায়াসে, ক্রমশ অপরিবর্তিত শিলাপৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। এই অবস্থায় স্তরগুলির মধ্যে কিছু কিছু চাক্ষুষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। শিলাখণ্ডের একদম কাছের যে স্তরটি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় কঠিন শিলা অপেক্ষাকৃত নরম অবস্থায় রয়েছে এবং ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ক্রমশ

উপরের দিকে অগ্রসর হলে দেখা যায় যে, যেমন রং-এর পরিবর্তন হচ্ছে, —হল্‌দে থেকে ছাই বা কৃষ্ণবর্ণ—তেমনি কণাগুলির আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়েছে, জলীয় অংশের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃষ্ঠস্থিত সর্বপ্রথম স্তরে উদ্ভিদ ইত্যাদি থেকে উদ্ভুত জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাবে।

তালিকা-1

	আগ্নেয় শিলা	মৃত্তিকা 1	মৃত্তিকা .2	মৃত্তিকা 3	মৃত্তিকা 4
SiO_2	59·1	69·3	57·5	74 7	19·9
M_2O_8	15·3	11·4	7·8	12·3	37·1
$F_{e\,2}O_3$	7·3	5·8	2·5	4·9	15·6
TiO_2	1·0	0·5	0·7	1·3	2·0
M_nO	0·1	0·2	0·2	0·3	0·3
C_aO	5·1	1·6	1·2	0·2	0·2
M_gO	3·5	0·9	0·6	0·1	0·5
K O	3·1	1·8	0·9	0·6	0·1
$N_{a\,2}O$	3·8	1·1	1·0	0·2	0·2
P_2O_5	0·3	0·2	0·2	0·2	0·3
SO_3	0·1	0 1	0·3	—	0·2
দহনজনিত ঘাটতি	1·2	9·5	27·2	7·1	24·1
জৈব পদার্থ	--	6·0	25·5	2·4	60

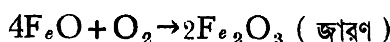
[] দহনজনিত ঘাটতির অন্তর্গত

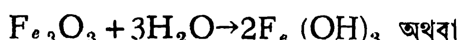
অনুরূপ তথ্যের ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ধারণা করা হয়। প্রধানত দিনে গরম, রাত্রে ঠাণ্ডার জন্য, তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনে শিলাস্তূপ ভেঙে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয়। এছাড়া কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও শিলাখণ্ড ধীরে অবিরাম গতিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শিলাস্তূপের ফাটলে জল বরফে পরিণত হলে আয়তন সম্প্রসারিত হয়, তার চাপেও শিলাস্তূপ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে থাকে।

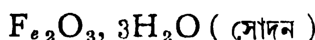
সোদন, জারণ বিজারণ এবং কার্বনেটকরণ এই তিনটি বিক্রিয়ার

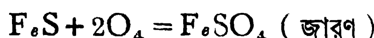
ফলে পাওয়া পদার্থগুলি আয়তনে বৃদ্ধি লাভ করে; শিলাখণ্ডের গা থেকে ধীরে ধীরে পাতলা পাতলা টুকরো আলগা হয়ে পৃথক হয়ে বেরিয়ে যায়। ফেরাসঅক্সাইড্ জারিত হয়ে জলের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রক্সাইড্ প্রস্তুত করে। তেমনি ফেরাস্ সাল্‌ফাইড জারিত হয়ে ফেরাস্ সাল্‌ফেট তৈরি করে। অন্যদিকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে জলপূর্ণ অবস্থায় ফেরিক অক্সাইড্ ফেরাস অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। আর্দ্র-বিশ্লেষ বিক্রিয়ায় শিলাস্থিত মিনারেল ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোদন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়! আর্দ্রবিশ্লেষলব্ধ ক্ষারীয় বস্তু বায়ুস্থিত কার্বন ডাই-অক্সাইডে আক্রান্ত হয়ে কার্বনেট প্রস্তুত করে। উল্লিখিত সব কয়টি বিক্রিয়ার আর একটি সাধারণ ফল হল আয়তন বৃদ্ধি। নিম্নের সমীকরণ বিক্রিয়াগুলির কার্যকলাপ জানাতে সাহায্য করবে:

তালিকা 2

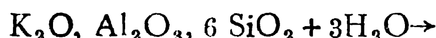

$4FeO + O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$ (জারণ)

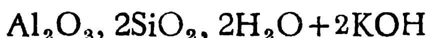

$Fe_2O_3 + 3H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3$ অথবা


$Fe_2O_3, 3H_2O$ (সোদন)


$FeS + 2O_4 = FeSO_4$ (জারণ)


$Fe_2O_3 \rightarrow FeO$ (বিজারণ, জলাবৃত অবস্থায়)


$K_2O, Al_2O_3, 6\ SiO_2 + 3H_2O \rightarrow$


$Al_2O_3, 2SiO_2, 2H_2O + 2KOH$


$+ 4SiO_2$ (আর্দ্রবিশ্লেষ)


$2KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$

(কার্বনেটকরণ)

উল্লিখিত আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে সিলিকেটের ক্ষারীয় ও আম্লিক উপাদানগুলি পৃথক হয়ে যায়। প্রচুর পরিমাণ বারিপাত হলে বিক্রিয়া-ঘটিত দ্রবণীয় উপাদানগুলি দূরীভূত হয়; স্বল্পদ্রব আম্লিক সিলিকেট প্রাধান্য লাভ করে। বস্তুত বিযোজিত সিলিকেটের রাসায়নিক সংযুতি আর্দ্রবিশ্লেষের তীব্রতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এইজন্য বারিপাত

ও উৎপন্ন-মৃত্তিকার সংযুক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরা পড়ে। আর্দ্র-বিশ্লেষ ছাড়া জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া পদ্ধতিতেও মিনারেলের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। সিলিকেট মিনারেলের রাসায়নিক বিযোজন প্রবণতা সাধারণতঃ অক্সিজেন ও সিলিকনের পারমাণবিক ব্যাসের অনুপাতের উপর নির্ভরশীল। নিচের তালিকায় দেখানো মিনারেলগুলির বিয়োজন-প্রবণতা বাম দিক থেকে ডাইনে বেড়ে যায়, কিন্তু অক্সিজেন-সিলিকনের অনুপাত হ্রাস পায়।

তালিকা 3

মিনারেল	অলিভিন	অগাইট	হর্নব্লেড	বায়োটাইট	কোয়াৎর্জ
OiSi	4	3	2·7	2·5	2

শিলাপৃষ্ঠ কঠিন হলে কোন কোন বৃক্ষ বা উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে পুষ্টি আহরণ করতে সমর্থ হয়। উদ্ভিজ্জের পত্রাদি কিম্বা অন্য কোন অংশ উপযুক্ত ও নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের উপস্থিতিতে জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়, ফলে পচনক্রিয়া ঘটে। এই পচনক্রিয়ার গতিবিধি নির্ভর করে জীবাণুর প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর। পচনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বহুবিধ জৈব অম্ল উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার উৎপত্তির কারণ হিসেবে এই সব অম্ল পদার্থের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবার উৎপন্ন মৃত্তিকা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে নতুন গুণধর্মের সৃষ্টি করতে পারে।

মৃত্তিকার উৎপত্তির প্রধান পাঁচটি কারণ, কি কি প্রক্রিয়া শিলাকে রূপান্তরিত করে তাদের কিছু পরিচয় দেওয়া হল। অতি মন্থর গতিতে এই রূপান্তর এগিয়ে যায় এবং যদি শিলাপৃষ্ঠ মোটামুটি সমতল হয় তা হলে মৃত্তিকা প্রস্তুতির কাজ ক্রমশ পৃষ্ঠদেশ থেকে শুরু করে নিচে অগ্রসর হতে থাকে, মৃত্তিকার স্তর ধীরে ধীরে গভীরতা লাভ করে। অবিকৃত শিলাপৃষ্ঠ থেকে মৃত্তিকার গভীরতা জেনে মৃত্তিকার বয়সেরও একটা আন্দাজ করা যায়। সমতল না হয়ে যদি নতিবিশিষ্ট হয়,

তা হলে বারিপাতের আক্রমণে উৎপন্ন মৃত্তিকা ঢালুদিকে সরে যায়। এই কারণে ঢালু শিলাপৃষ্ঠের মৃত্তিকার গঠন আলাদা হয়। নদী খালের ঘোলা জলে যে মৃত্তিকা ভাসমান তার আংশিক উৎস হল ঢালু জমি থেকে ধুয়ে আসা মাটি। পলিমাটির উৎপত্তিতে এই ধারক।

আগেই শিলা ও মৃত্তিকার সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার তারতম্যের কথা জানানো হয়েছে। এদের অজৈব অংশের প্রধান উপাদানগুলি কেলাসিত। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর পদার্থের কেলাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে, যার ফলে মৃত্তিকার জলধারণের ক্ষমতাও ভিন্ন। এক্স্-রে বিশ্লেষণ সাহায্যে দেখা গিয়েছে যে মৃত্তিকাস্থিত সিলিকেট কেলাস দ্বিমাত্রিক কিন্তু শিলাস্থিত সিলিকেট কেলাস ত্রিমাত্রিক। এই রূপান্তর কি ভাবে যে ঘটে তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে শিলাস্থিত ত্রিমাত্রিক সিলিকেট কেলাস আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়ে প্রধানত এলুমিনিয়াম ও আয়রণ অক্সাইড কিম্বা হাইড্রক্সাইড এবং সিলিসিক অম্ল বা সিলিকা উৎপন্ন করে। বিশ্লিষ্ট অণুগুলির মধ্যে পুনরায় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অথবা স্থানান্তরিত হয়, অর্থাৎ পুনরায় বিক্রিয়াকালে তারা অংশগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র অবশিষ্ট অণুগুলিই বিক্রিয়ায় অংশ-গ্রহণ করে। মনে রাখা দরকার যে শিলা উৎপত্তিকালীন উচ্চ চাপ কিম্বা তাপের পরিবর্তে মৃত্তিকা প্রস্তুতির সময় সাধারণ তাপ ও চাপই দরকার; এবং তাই পাওয়া যায়। সুতরাং বিশ্লিষ্ট অণুগুলি শিলা বা সমগুণ বিশিষ্ট পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে না। অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী মৃদু পরিবেশে বিশ্লিষ্ট অণুগুলি সহজ পদ্ধতিতে দ্বিমাত্রিক (অথবা কখনও এক মাত্রিক) কেলাসে রূপান্তরিত হয়। এখানে উদাহরণ স্বরূপ খাদ্যগ্রহণ ও দেহ পরিপুষ্টির বিষয়টি উল্লেখ করা অবান্তর হবে না। খাদ্যের উপাদান,যথা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি ইত্যাদি, পাকস্থলীতে গিয়ে এন্‌জাইম সাহায্যে আর্দ্রবিশ্লেষ বিক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়। যেমন, প্রোটিন থেকে এমিনো এসিড।

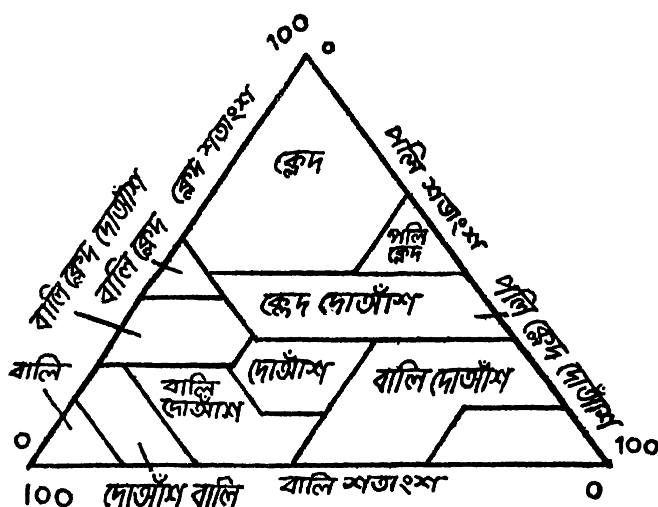
এমিনো এসিড যথাস্থানে প্রবাহিত হয়ে অবস্থানুসারে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়! কিন্তু যে-প্রোটিন খাদ্যে ছিল তার সঙ্গে রূপান্তরিত প্রোটিনের বিশেষ কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে যে ঐ এমিনো এসিডগুলি পাত্রভেদে প্রোটিনে রূপান্তরিত না হয়ে অন্যভাবে পরিবর্তিত হলো এবং শরীরের কোন কাজে লাগার পূর্বেই নিষ্কাশিত হয়ে গেল।

শিলাস্থিত মিনারেলগুলিকে সাধারণতঃ প্রাথমিক পর্যায়ের এবং মৃত্তিকাস্থিত মিনারেলগুলিকে মাধ্যামিক পর্যায়ের বলা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের মিনারেলগুলির কয়টি মৃত্তিকায় সাধারণত পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কেওসিনাইট, মণ্ট্‌মরিলনাইট, ইলাইট, বাইডেলাইট ও ভার্মিকিউ-লাইট উল্লেখযোগ্য।

শিলা থেকে মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। দুটি পদার্থের কেলাসিত মিনারেলের বিন্যাস যে অভিন্ন নয় সে বিষয়েও জানা গেল। মৃত্তিকার আরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার পরিচয় বাঞ্ছনীয়। মৃত্তিকার অজৈব অংশ নানা আয়তনের কণাদ্বারা গঠিত। এই কণাসমষ্টিকে মোটামুটি তিনটি ভাবে বিভক্ত করা হয় (আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসারে)।

$<0·002$ মি. মি. কণাসমষ্টিকে ক্লেদ বা কর্দম বলা হয় ; 0·002—0·02 মি. মি. কণাসমষ্টিকে পলি বলা হয়। এবং 0·02—2 মি. মি. কণাসমষ্টিকে বালুকা বা বালি বলা হয়। বালিকে মিহি (0·02—0·2 মি. মি.) ও মোটা (0·2—2 মি. মি.) শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সূক্ষ্ম ক্লেদ অংশই সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াক্ষম। মৃত্তিকার জল আকর্ষণ করে যে ফুলে ওঠে তার জন্য প্রকৃত দায়ী মৃত্তিকার ক্লেদ অংশ। ক্লেদের সঙ্গে পলি ও বালি বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত থাকলে ক্লেদের বৈশিষ্ট্য-গুলি কমবেশী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ক্লেদ অন্য দুটি কণাসমষ্টিকে গ্রথিত করে ; এইজন্য তিনটি অংশের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় গ্রথন। মৃত্তিকার গ্রথন (অর্থাৎ ক্লেদ-পলি-বালির অনুপাত) অনুসারে তার প্রয়োগবিধি

নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রয়োগক্ষেত্রে যথাসম্ভব উপযুক্ত গ্রথন বাঞ্ছনীয়। যেমন, কৃষিকার্যে ক্লেদ অংশ অধিক হলে জল ও আয়নধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু জলনিকাশ ব্যাহত হয়, শুষ্ক অবস্থায় মৃত্তিকায় ফাটল ধরে ; কঠিনত্ব ধরা পড়ে! তাতে কৃষিকর্মের ব্যাঘাত ঘটে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে 10-25 শতাংশ ক্লেদ, 20-50 শতাংশ বালি এবং 70-90 শতাংশ পলিযুক্ত মৃত্তিকাই বিভিন্ন দিক থেকে কৃষিকর্মে উৎকৃষ্ট। মৃৎশিল্পে ক্লেদ এবং বালি অংশ অপেক্ষাকৃত



চিত্র 2

কম হওয়া বাঞ্ছনীয়, অতএব পলি অংশই সর্বাধিক। ইট তৈরির কাজেও ঐরূপ অনুপাত রাখা কাম্য। পেট্রোলিয়াম উদ্ধার কার্যে সেই মৃত্তিকাই উপযোগী যার ক্লেদ অংশ অধিক, অথবা কেবলমাত্র ক্লেদ অংশই (বিশেষ করে মণ্ট্‌মরিলনাইট শ্রেণীর) ব্যবহার্য।

চলতি কথায় বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, দো-আঁশ মাটি বলা হয়। এই বিবরণের মূল ভিত্তি হল, গ্রথন। ক্লেদ-পলি-বালি এই তিনটি উপাদানের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। নির্ণীত পরিমাণের শতাংশ একটি সমভুজ ত্রিকোণ গ্রাফে প্রকাশ করা সম্ভব (চিত্র-2)।

এখানে সাজানোর উদাহরণ হলো তিনটি উপাদানের সংখ্যানুপাত। আবার এই অনুপাতে বিভিন্ন মৃত্তিকার গ্রথনের শ্রেণী নির্দিষ্ট করা যায়। আমেরিকার মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ যে সব চিহ্নিত করেছে সেগুলিই এখন সর্বত্র গ্রাহ্য হয়েছে।

মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন আয়তনের কণা-সমষ্টি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থেকে বহুরকম ছোট-বড় দানা সৃষ্টি করে। এই বন্ধনের কাজে ক্লেদ অংশের ভূমিকা যথেষ্ট। মৃত্তিকার জৈব অংশের মধ্যে হিউমাস্, গাম্ ও পেকটিন জাতীয় দ্রব্যাদি কম-বেশী পরিমাণে থাকে। এদের উদ্ভব উদ্ভিজ্জ পত্রাদি আর জীবাণুর দেহাবশেষ থাকে। ছোট-বড় দানাগুলির পারস্পরিক অবস্থান মৃত্তিকার গঠন নির্ণয় করে। মৃত্তিকার গঠনের বৈশিষ্ট্যের ধারায় কৃষিকর্ম প্রভাবিত হয়। জল ও বায়ু চলাচলের সুবিধা-অসুবিধা, গাছের শিকড়ের গতিবিধি ইত্যাদি সবকিছু নির্ভর করে মৃত্তিকার গঠনের উপর। ছোট ছোট দানা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে জল-বায়ু চলাচল সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। গাছের শিকড়ও অবাধগতিতে অগ্রসর হতে পারে। কৃষিকর্মে এইরকম গঠনেরই মৃত্তিকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। যে মৃত্তিকাতে কণাগুলি পরস্পর দৃঢ় বাঁধনের ফলে বড় বড় আয়তনের চাঙর বা মাটির তাল তৈরি করে সেই মৃত্তিকায় জল-বায়ু চলাচল ব্যাহত হয় এবং গাছের শিকড় খাদ্য আহরণের জন্য বেশী গভীরে যেতে পারে না। সুতরাং গাছ পুষ্টির অভাবে ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়ে।

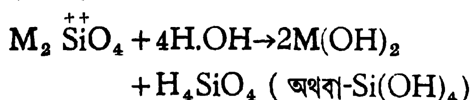
মৃত্তিকার গঠনের একটি মাপকাঠি ঠিক করা সম্ভব। কণাসমষ্টির বাঁধুনীর দৃঢ়তার উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকার গঠনের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এইজন্য বাঁধুনীর একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা ধরে নিতে হয়। বড় থেকে ছোট ছিদ্রবিশিষ্ট এক সারি চালনী সাজানো হল এবং পরিমিত মৃত্তিকা 2 মি. মি. ব্যাস ছিদ্রবিশিষ্ট সর্বোপরি চালনীতে রাখা হল। চালনীগুলি সারিবদ্ধ অবস্থায় একটি জলভরা পাত্রে ডুবিয়ে দেওয়া হল এবং 20-25 বার উপর-নীচ ওঠানো-নামানো হল। এই প্রক্রিয়ায়

জলের আঘাতে শিথিল বাঁধুনীযুক্ত কণাসমষ্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ নিচের ছোট ছিদ্রযুক্ত চালনীগুলিতে আশ্রয় নেয়। প্রত্যেকটি চালনীর ছিদ্রের ব্যাস জানা আছে, সুতরাং একটি গ্রাফ্ টেনে বলা যায় মৃত্তিকার কত শতাংশ >0.25 মি. মি. ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত চালনী-গুলিতে ধরা পড়বে। মৃত্তিকার এই আনুপাতিক পরিমাণ কণাসমষ্টির বাঁধুনীর একটি পরিমাণ বলে গণ্য করা হয়। যে মৃত্তিকার বেলায় এই আনুপাতিক সংখ্যাটি যত বড়, গঠনও তার তত দৃঢ় হবে। এইভাবে বিভিন্ন মৃত্তিকার মধ্যে একটি তুলনামূলক মাপকাঠি রচিত হয়েছে। তাছাড়া সেক্সন্ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বিভিন্ন ব্যাসযুক্ত কণাগুলির আনুপাতিক হিসাবে পাওয়া যায়, এই তথ্যের ভিত্তিতেও গঠন সম্পর্কে একটি আপেক্ষিক মাপকাঠি স্থির করা যেতে পারে।

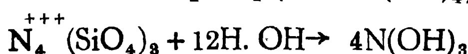
বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া মৃত্তিকার বর্ণ বা রঙ পৃথক। বস্তুত প্রথমেই চোখে পড়ে মাটির রঙ। হাল্কা ও গাঢ় ছাই, বিভিন্ন আভাযুক্ত কালো, বাদামী, লাল, হল্‌দে ইত্যাদি নানা রঙ-এর মৃত্তিকা দেখা যায়। মৃত্তিকার যে দুটি উপাদান রঙ-এর জন্য প্রধানত দায়ী তা হল লৌহ-ঘটিত কয়েকটি মৌল, বিশেষ করে বিভিন্ন আর্দ্রতাযুক্ত অক্সাইড, এবং জৈব পদার্থ। ছাই, কালো এবং বাদামী রঙ-এর মৃত্তিকাতে অবশ্যই জৈব পদার্থও পাওয়া যাবে। লৌহঘটিত অক্সাইড হল্‌দে, লাল এবং কখনও বাদামী রং-এর হতে পারে। লৌহ ও জৈব পদার্থসঞ্জাত নানা রঙ-এর যৌগ অবস্থাভেদে মৃত্তিকায় উৎপন্ন হতে পারে। যেখানেই জারণ ক্রিয়া প্রবল সেখানে লাল মাটি প্রাধান্য লাভ করে। জারণের ফলে জৈব পদার্থ বিয়োজিত হয়; লৌহের লাল অক্সাইডের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিজারিত অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প জারিত অবস্থায় জৈব পদার্থ কিছু অবশিষ্ট থাকে এবং লৌহ অক্সাইড ও মিশ্রজারিত অবস্থায় পরিণত হয়। এর ফলে মৃত্তিকার রঙ কৃষ্ণাভ কিম্বা বাদামী হতে পারে। অতএব রঙ দেখে মৃত্তিকা কি ধরণের বিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মৃত্তিকার রঙ-এর আপাত গাঢ়তা আর্দ্রতার উপরও অংশত নির্ভর করে। শুকানো মৃত্তিকার রঙ হাল্‌কা হয়, কিন্তু জলসম্পৃক্ত অবস্থায় গাঢ়তর মনে হয়। সুতরাং শুষ্ক কিম্বা আর্দ্র কোন্ অবস্থায় রঙ বিচার করা হল বিশেষ করে সেই উল্লেখ করা উচিত। চলতি ভাষায় রঙ-এর বিবরণ আবার সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। এইজন্য একটি রঙ-এর চার্ট তৈরি হয়েছে--নাম দেওয়া হয়েছে ম্যুন্‌সেল চার্ট। বিভিন্ন অনুপাতে লাল ও হলুদ এবং তার সাথে কালো রং মিশিয়ে অনেকগুলি মিশ্রণ তৈরি করা যায় যাদের গাঢ়তা ও আভা বিভিন্ন। রঙিন চার্টের যে কোন একটি রঙ-এর সঙ্গে মৃত্তিকার রঙ সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা কাছাকাছি মিলে যাবে। এইভাবে একটি নিরপেক্ষ মাপকাঠির সাহায্য মৃত্তিকার রঙ চাক্ষুষ না দেখেও চার্টের সাহায্যে পরিচয় পাওয়া যায়।

আগে জানানো হয়েছে যে, শিলাখণ্ড বা শিলাচূর্ণ আর্দ্র বিশ্লেষ বিক্রিয়ার প্রভাবে সিলিকা, এলুমিনা, আয়রণ অক্সাইড ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এই বিক্রিয়াগুলির সমীকরণ থেকে H^+ আয়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।



$$M_2 \overset{++}{Si}O_4 + 4H.OH \rightarrow 2M(OH)_2 + H_4SiO_4 \text{ (অথবা-} Si(OH)_4 \text{)}$$



$$\overset{+++}{N_4}(SiO_4)_3 + 12H.OH \rightarrow 4N(OH)_3$$

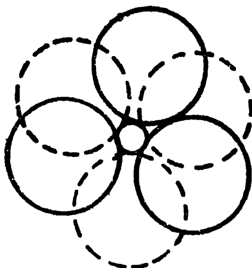
$+ 3H_4SiO_4$ (অথবা $3\ Si(OH)_4$) H^+ আয়নের পরিমাণ বাড়ালে ধাতব হাইড্রক্সাইড যৌগের (এগুলি সাধারণতঃ স্বল্প দ্রাব্য) দ্রাব্যতা বৃদ্ধি পায়।

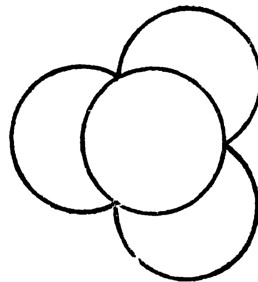
H_4SiO_4-কে বলা হয় অর্থোসিলিসিক অম্ল। নিরুদন প্রক্রিয়ার এটি সহজেই মেটাসিলিসিক অম্লে পরিণত হয়।

$H_4SiO_4 - H_2O = H_2SiO_3$. মেটাসিলিসিক অম্ল অধিকতর স্থায়ী ও সাধারণ সিলিকেট লবণ তৈরি করে। নিরুদন প্রক্রিয়া সাহায্যে মেটাসিলিসিক অম্ল সিলিকা ($H_2SiO_3 - H_2O = SiO_2$) বা বালুকায় পরিণত হয়। সিলিকেট বিয়োজনের এটাই চরম স্থায়ী

যৌগ। H^+ আয়নের আধিক্যের ফলে সিলিসিক অম্লের অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বিয়োজন বাম দিক থেকে ডাইনে অগ্রসর হতে থাকে। H^+ আয়নের পরিমাণ অল্প হলে সিলিসিক অম্লের অনুপাত হ্রাস পায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে H^+ আয়নের প্রভাবে মৃত্তিকা তৈরির উপাদানগুলির আনুপাতিক তারতম্য ঘটতে পারে। এইভাবে উদ্ভূত মৃত্তিকার কেলাসিত মিনারেলের এবং তাদের রাসানিক সংযুক্তির পার্থক্য ঘটে থাকে।

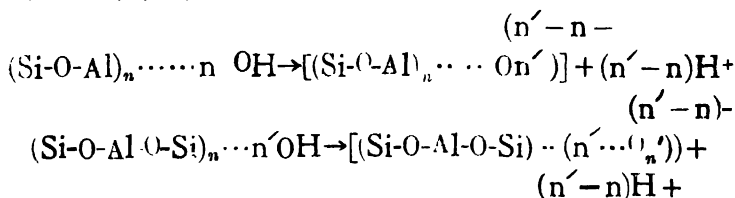
মৃত্তিকাস্থিত কেলাসিত মিনারেল সাধারণত ক্লেদ অংশেই বিদ্যমান। মিনারেলগুলির দ্বিমাত্রিক কেলাসে সিলিসিক অম্ল বা সিলিকন হাইড্রক্সাইড, H_4SiO_4 বা $(OH)_4$ Si একটি চতুস্তল [চিত্র-3(a)] আকৃতি লাভ করে। অ্যালুমিনিয়াম অথবা আয়রণ Fe^{+++} হাইড্রক্সাইড-এর $(OH)_6Al_2(Fe_2)$] যৌগের আকৃতি ষষ্ঠতল [চিত্র-3(b)] $(OH)_4Si$ অথবা $(OH)_6$ Al_2 (Fe_2) অণুগুলি পরপর সাজিয়ে একটি দ্বিমাত্রিক স্তর তৈরি করা যায়। শৃঙ্খলায়ন পদ্ধতিতে এই স্তরটি


চিত্র 3 a)


চিত্র 3 b)

তৈরি হতে পারে। এই দুটি স্তরকে একটির উপর আর একটি এমনভাবে সংস্থাপন করা যায় যাতে করে এরা যুক্ত হতে পারে। নিরুদন বিক্রিয়ার ফলে এই স্তর দুটি অক্সিজেন পরমাণুর মাধ্যমে একটি দ্বিমাত্রিক দ্বিস্তর মিনারেল তৈরি করে (চিত্র-4)। এদের সংক্ষেপে বলা হয় 1 : 1 মিনারেল। কেওলিনাইট এই 1 : 1 মিনারেল শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ অবস্থায় এলুমিনিয়াম স্তরের দুদিকে দুটি সিলিকা স্তর সংযোজিত করা সম্ভব, যার ফলে একটি দ্বিমাত্রিক ত্রিস্তর (1 ঃ 2) মিনারেল তৈরি হয়। 1 ঃ 2 মিনারেলের নাম দেওয়া হয়েছে পাইরোফিলাইট। 1 ঃ 1 এবং 1 ঃ 2 মিনারেলের স্থূল সংক্ষেপিত সঙ্কেত যথাক্রমে Si-O-Al এবং Si-O-Al-O-Al-O-Si. একটি স্তরে বহুসংখ্যক Si-O-Al এবং Si-O-Al-O-Si-এর ইউনিট বা একক থাকে। শৃঙ্খলায়ন বিক্রিয়ালব্ধ বৃহদাকার অণুগুলির সঠিক সঙ্কেত হবে যথাক্রমে ঃ $(Si\text{-}O\text{-}Al)_n$ ও $(Si\text{-}O\text{-}Al\text{-}O\text{-}Si)_n$. এই দুটি পদার্থই তড়িৎ নিরপেক্ষ। Si এবং Al-এর সঙ্গে যুক্ত OH (সঙ্কেতে লেখা হয় নি) থেকে H^+ আয়ন বিযুক্ত হয়ে মিনারেলটি অম্লস্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষারীয় পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারে।



$$(Si\text{-}O\text{-}Al)_n \cdots\cdots n\ OH \rightarrow [(Si\text{-}O\text{-}Al)_n \cdots\cdots On')]^{(n'-n)-} + (n'-n)H^+$$

$$(Si\text{-}O\text{-}Al\text{-}O\text{-}Si)_n \cdots n'OH \rightarrow [(Si\text{-}O\text{-}Al\text{-}O\text{-}Si) \cdot\cdot (n' \cdots O_n'))^{(n'-n)-} + (n'-n)H^+$$

অন্য একটি উপায়ে মিনারেলগুলি ঋণাত্মক আধান প্রাপ্ত হতে পারে। Si^{4+}-এর পবির্তে যদি Al^{3+}, সিলিকাস্তরে প্রবেশ করে, অথবা এলুমিনা স্তরে Al^{3+}-এর পরিবর্তে Mg^{2+}, তা হলে উদ্ভূত মিনারেল ঋণাত্মক চার্জ প্রাপ্ত হবে। যেমন,

A. $(Si—O—Al)_n \rightarrow [Si_{n-1}(Al)(—O—Al)]_n$

B. $(Si—O—Al)_n \rightarrow [(Si—O)_n—Al_{n-\frac{n}{1}} Mg]^-$

C. $(Si—O—Al—O—Si)_n \rightarrow$

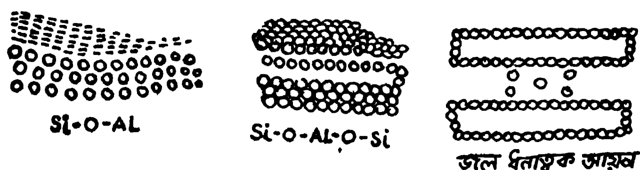
$[Si_{n-1}(Al)(—O—Al—O—Si)_n]^-$

D. $(Si—O—Al—O—Si)_n \rightarrow [(Si—O)_n$

$—Al_{n-1}Mg(—O—Si)_n]^-$

Al^{3+} ও Mg^{2+} যে পরিমাণে Si^{4+} ও Al^{3+}-কে যথাক্রমে বিনিময় করতে পারবে, মিনারেলগুলি ঠিক তত ইউনিট ঋণাত্মক চার্জ লাভ

করবে। মৃত্তিকা কিম্বা অন্যত্র যে সব মাধ্যমিক মিনারেল পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে উক্ত প্রকার বিনিময় কেবলমাত্র ত্রিস্তর 1 : 2 পাইরোফিলাইট বা সমধর্মী মিনারেলের বেলায়ই পাওয়া গিয়েছে। 1 : 1 কেওলিনাইটের বেলায় এটি খুবই বিরল অথবা হয়না বলা চলে।



চিত্র 4

যদি বিনিময় (D) সমীকরণ অনুযায়ী ঘটে তা হলে মণ্টমরিলনাইট শ্রেণীর মাধ্যমিক মিনারেল উৎপন্ন হবে। কিন্তু সমীকরণ (C) অনুযায়ী ঘটলে উদ্ভূত মিনারেল মাইকা বা অভ্রশ্রেণীভূক্ত হবে। মাধ্যমিক মিনারেল ইলাইটকে অভ্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। কোন কোন মিনারেলে উভয়বিধ বিনিময় সংঘটিত হতে পারে। সে রকম মিনারেলও মৃত্তিকায় পাওয়া যায় যেমন বাইডেলাট।

এই সকল ঋণাত্মক আধানযুক্ত মিনারেল কণা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ধণাত্মক আয়ন যথা, $H^{\mp}$, K^{+}, Ca^{++} ইত্যাদি আকর্ষণ করে এবং প্রশম বা নিউট্রাল অবস্থায় পরিণত হয়। এই সকল ধনাত্মক আয়ন বিনিময় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যেমন $1+^{\mp}$ আয়নের প্রাধান্য ঘটলে মৃত্তিকা অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু অতিবৃহৎ মিনারেল অণু বা কণার দ্রাব্যতা নগণ্য, বিনিময়কারী আয়নগুলি কণা থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হতে পারে না। অদ্রবণীয় কণার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়ই পরিমাপক যন্ত্র সাহায্যে H^{+} আয়ন মাপা যায় যেমন সাধারণ অম্লদ্রবণের বেলায় করা হয়। H^{+} আয়নের পরিমাণ $pH\left(=\log 1\frac{l}{CH^{+}}\right)$ প্রতীকে প্রকাশ করা হয়। pH সংখ্যা জানা গেলে মিনারেলের অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্ব সম্পর্কে জানা যায়। অধিক অম্ল অথবা ক্ষার অবস্থার মৃত্তিকা

সাধারণ কৃষিকর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত অতএব পরিমিত ক্ষার অথবা অম্লদ্বারা প্রশমনের প্রয়োজন হয়। মিনারেলস্থিত H^+ আয়ন ক্ষারীয় পদার্থের সঙ্গে নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুসারে বিক্রিয়া করে :



[মিনারেল $]_n^- - nH^+ + nB(KH) \rightleftharpoons$

[মিনারেল $]^- - nB^{\mp}$ $nH.OHB^+$ যদি $\overset{+}{N_a}$ কিংবা K^+ হয় তাহলে আদ্র বিশ্লেষ বিক্রিয়া দ্বারা [মিনারেল]—$_n$nB প্রলম্বিত অবস্থায় ক্ষারীয় pH প্রদর্শন করবে। যেমন :



[মিনারেল $]_n nN + nH\ OH \rightleftharpoons$

[মিনারেল]—$_n - nH + nN_aOH$ যেহেতু N_aOH তীব্র ক্ষার এবং [মিনারেল $]_n - nH^+$ মৃদু অম্ল, pH ক্ষারীয় অবস্থার সূচনা করবে। H^+ আয়ন বিনিময় দ্বারা অম্ল অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায়। এইরূপ বিনিময় বিক্রিয়া অন্য কোন ধনাত্মক আয়ন দ্বারাও সংঘটিত হতে পারে। আয়ন বিনিময় বিক্রিয়া দ্বিমাত্রিক মিনারেলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধনাত্মক আয়নের প্রকৃতি ও আনুপাতিক পরিমাণের উপর মিনারেলের অম্লত্ব, ক্ষারত্ব এবং প্রশম অবস্থা নির্ভর করে। পুষ্টির জন্য উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় আয়ন মৃত্তিকা থেকে আয়ন-বিনিময় বিক্রিয়ার মাধ্যমেই গ্রহণ করে। কৃষিকর্মে মৃত্তিকার pH সাধারণতঃ 7-এর কিছু কমই বাঞ্ছনীয়, কারণ এই pH উদ্ভিদের পক্ষে যেমন উপযুক্ত, তেমনই মৃত্তিকাস্থিত জীবাণুর কার্যকারিতাও 7-এর কম pH-এ পূর্ণমাত্রার বজায় থাকে। pH 7-এর বেশী হলে মৃত্তিকার বৈগুণ্য দেখা দেয়; গ্রথন ও গঠন ভেঙ্গে যায়। জলের সংস্পর্শে ক্লেদ অংশ অন্যান্য কণাসমষ্টি থেকে বন্ধনমুক্ত হয়; বারিপাতের সময় ভাসমান প্রলম্বিত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয় অথবা জলস্রোতে নদী-নালায় বেরিয়ে যায়। ক্ষারীয় pH মৃত্তিকা অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু এই অবস্থায় উদ্ভিদের পুষ্টি ব্যাহত হয়, ক্ষারীয় pH-যুক্ত মৃত্তিকা অল্পকালের মধ্যেই অনুর্বর হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে মৃত্তিকাকে

সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে উপযুক্ত পরিমাণ অম্লদায়ী বস্তুর (যথা গন্ধক) সঙ্গে বহুদিনব্যাপী বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এছাড়া স্বল্পদ্রব $CaSO_4$ (জিপ্‌সাম) আয়ন বিনিময় বিক্রিয়ায় মৃত্তিকাস্থিত Na^+-কে Ca^{++} দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারে, যার ফলে প্রলম্বিত মৃত্তিকা অধঃক্ষিপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, pH-প্রশম অবস্থায় ফিরে আসে।

মৃত্তিকায় pH 7-এর খুব কম হলেও সাধারণ কৃষিকার্য ব্যাহত হয়। উদ্ভিদের পক্ষে অধিক অম্ল অবস্থা পুষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ H^+ আয়নের উপস্থিতি একদিকে যেমন K^+, Ca^{++} এবং ফস্‌ফরাস দুর্লভ হয়ে পড়ে, তেমনই Al^{3+} আয়নের আধিক্য ঘটায়। এই শেষোক্ত আয়ন উদ্ভিদ এবং জীবাণুদের কাছে যেন বিষ! pH প্রশম অবস্থার কাছাকাছি ($\simeq 7$) ফিরিয়ে আনতে পরিমিত মাত্রায় চূনের প্রয়োগই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

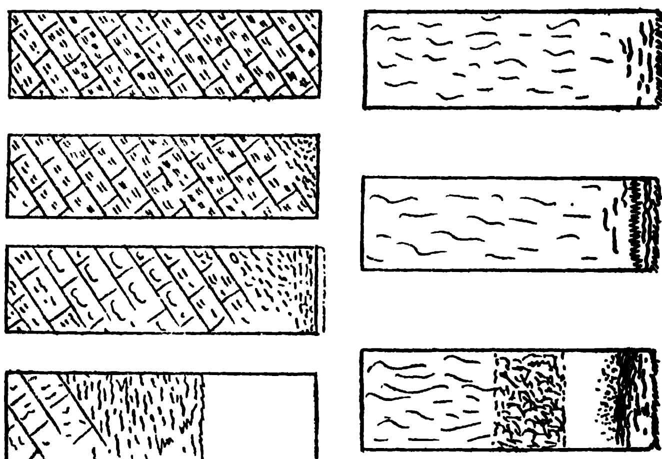
বৃক্ষাদির পুষ্টিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ন, যথা K^+, C_a^{++}, M_g^{++}, C_u^{++}, Z_u^{++} ইত্যাদি সাধারণতঃ ক্লেদ অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। শিকড়ের মাধ্যমে বৃক্ষাদি মৃত্তিকার ক্লেদ কণা থেকে অথবা সংবদ্ধ জলীয় ভাগ থেকে ঐ আয়নগুলি আহরণ করতে পারে। ঋণাত্মক আয়ন, যথা নাইট্রেট ও সালফেট ক্লেদ অংশের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না, কারণ উভয়ই ঋণাত্মক। এরা দ্রবণ অবস্থায় থাকে এবং গাছ তার শিকড়ের মাধ্যমে এদের প্রয়োজন মত আহরণ করে। ফস্‌ফেট মৃত্তিকার সঙ্গে নানারকম জটিল বিক্রিয়া ঘটায়। ক্লেদ অংশ এ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। তা ছাড়া মৃত্তিকাস্থিত মুক্ত এ্যালুমিনা এবং আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে স্বল্পদ্রব ফস্‌ফেট দুর্লভ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মৃত্তিকার pH যদি 7-এর কাছাকাছি রাখা যায় তা হলে ফস্‌ফেটের সুলভ্যতা বৃদ্ধি পায়। জৈব সার প্রয়োগেও ফস্‌ফেট সুলভ্য হতে পারে।

কৃষিকর্ম ছাড়া মৃত্তিকার অন্য যে কয়টি প্রয়োগের উল্লেখ করা

হয়েছে তার মধ্যে ইট এবং পোর্সিলেনের বাসনপত্র তৈরি অন্যতম। সব রকম মৃত্তিকা ইট তৈরির পক্ষে উপযুক্ত নয়। ক্লেদ, পলি এবং বালির নির্দিষ্ট অনুপাত যে মৃত্তিকাতে থাকে সেই মৃত্তিকাই ইট তৈরির উপযোগী। এতে সাধারণত ক্লেদ অংশ কম থাকে এবং পলি অংশ সর্বাধিক। পোর্সিলেনের জন্য উপযুক্ত হল পরিশুদ্ধ কেওলিনাইট জাতীয় মিনারেল। খনিজ পদার্থরূপে কেওলিনাইট বহু জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু পোর্সিলেনের কাজের জন্য উপযুক্ত করতে কতকগুলি পদ্ধতির সাহায্যে পরিষ্কার করে নিতে হয় এই শিল্পটি বর্তমানে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

পৃথিবীর গর্ভ থেকে পেট্রোলিয়াম উদ্ধারকার্যে মণ্টমরিলনাইট জাতীয় মিনারেল (বেণ্টোনাইট) এই কাজে ব্যবহৃত হয়। উদ্ধারকার্যের ব্যবস্থাটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ একটি পাথর কাটার ধারালো অগ্রভাগকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির নিচে নামানো হয়। চারিদিকে ঘিরে একটি নল, মধ্যবর্তী স্থানে নির্দিষ্ট রীতিতে বেণ্টোনাইট প্রলম্বন রাখা হয়। এই প্রলম্বনটি বিশেষ গুণসম্পন্ন। যখন স্থির থাকে তখন আংশিক কঠিনত্বের অধিকারী এবং সান্দ্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর যখন আলোড়িত করা হয় তখন তরলতা লাভ করে এবং সান্দ্রতা হ্রাস পায়। সুতরাং পাথর কাটার যন্ত্রটি নামানোর সময় তরল অথচ অপেক্ষাকৃত সান্দ্র প্রলম্বনটি গমন পথ মসৃণ রাখে। পেট্রোলিয়াম স্তরে পৌঁছে গেলে উদ্ধারকার্য শুরু করার পূর্বে নলটির মধ্যে চাপ দিয়ে প্রলম্বনটি বাইরে ঠেলে দেওয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রলম্বনটির কঠিনত্ব ও সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বাইরে জমে যায়। ভিতরের নল দিয়ে পেট্রোলিয়াম বেরিয়ে আসার সময় প্রলম্বনটি অন্যত্র বহির্নির্গমনের পথ বন্ধ করে রাখে। প্রলম্বনটি ঘনত্ব এমন যে কাটার সময় পাথরের টুক্‌রো উপরে ভেসে উঠতে পারে, ফলে ধারালো মুখের কাছে জমা হয় না। ঘনত্ব এবং সান্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত করা হয় যথা বেরিয়াম সালফেট ($BaSO_4$)[8] কার্বাক্সিমিথাইল সেলুলোজ ইত্যাদি। প্রলম্বনটির

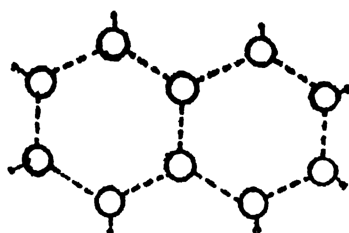
যে গুণের বিষয়ে উল্লেখ করা হল তাকে থিক্সট্রপি বলা হয়। মৃত্তিকাস্থিত একমাত্র মণ্ট্‌মরিলনাইট জাতীয় মিনারেলই এই ধরনের গুণের অধিকারী। একটি ত্রিস্তর (1 : 2) মিনারেল কণার মধ্যে বিকর্ষণই আশা করা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে অন্য উপায়ে বন্ধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। দ্বিযোজী কিংবা ত্রিযোজী ধনাত্মক আয়ন দুই কণার মাঝখানে উপস্থিত থেকে বন্ধনের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কণার আয়তন অত্যধিক বলে এই বন্ধন তত দৃঢ় নয়। কিন্তু ত্রিস্তর মিনারেলের আর একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হল জল আকর্ষণের ক্ষমতা। জলের সঙ্গে বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধনীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। মিনারেলের কণাগুলি পাতলা দ্বিমাত্রিক পাতার উপর হাইড্রোজেন বন্ধনী সাহায্যে একটি সুনির্দিষ্ট দ্বিমাত্রিক বিন্যাস রচনা করতে পারে (চিত্র-5)। অতএব দুটি কণাকে যদি কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তা হলে জলের দ্বিমাত্রিক বিন্যাস দুটি কণাকে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বেঁধে



চিত্র—5

রাখতে পারে। মণ্ট্‌মরিলনাইট প্রলম্বন কোলয়ডীয়; সুতরাং কণাগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই থাকে। কিন্তু সামান্য লবণের সংস্পর্শে অধঃক্ষেপণ কিম্বা তঞ্চন প্রবণতা লাভ করে। এই অবস্থায় কণাগুলি

পরস্পরের সন্নিকটে আসে অথচ সম্পূর্ণরূপে তঞ্চিত হয় না, কিন্তু উল্লিখিত পদ্ধতিতে বন্ধনযুক্ত হতে পারে। উৎপন্ন প্রলম্বনে কণাগুলির মধ্যে বন্ধন কিছু দৃঢ় হয় বটে, কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। এইরূপে প্রলম্বনটি থিক্সট্রপি গুণ প্রদর্শন করে। স্থির অবস্থায় কণাগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনীর প্রভাবে বিন্যস্ত হয় এবং প্রলম্বনটি আংশিক কঠিনতা এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করে কিন্তু ঝাঁকালেই কণাগুলির মধ্যে বন্ধন সাময়িক ভাবে শিথিল হয়ে পড়ে ; তরলতা প্রদর্শন করে। এই উভমুখী পরিবর্তন বারবার করা যায়।



চিত্র—৬

মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখতে পাই তৈল শোধনে। পদ্ধতিটি হলো : মৃত্তিকার অন্যান্য উপকরণ থেকে মণ্টমরিলনাইট জাতীয় মিনারেলের ক্লেদ অংশ পৃথক করে H^+ আয়ন দ্বারা সম্পৃক্ত করা হল। অতঃপর প্রায় 24 ঘণ্টা ধরে অতি ধীরে 300°-400°C-এ উত্তপ্ত করা হল। এই প্রক্রিয়ায় জল নির্গত হয়ে মিনারেলটি সক্রিয় অবস্থায় পরিণত হয় এবং শোষণ-ক্ষমতা লাভ করে। এইবারে এটি তৈল শোধনে ব্যবহার করা হয়। শোষণযোগ্য তেলের সঙ্গে পরিমিত মাত্রায় সক্রিয় মিনারেল বেশ ভালভাবে মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। মিনারেল কণাগুলি তেলের ময়লা এবং রঞ্জকজাতীয় দ্রব্যাদি শোষণ করে নেয়। এরপর পরিস্রাবণ করে নিলেই পরিষ্কার তেল পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা কতরকমের হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। আপাত দৃষ্টিতে অল্প দূরত্বের মধ্যেই পার্থক্য ধরা যায়। কিন্তু এই বিভিন্নতা

কতখানি অর্থপূর্ণ তা সহজে বোঝা যায় না। তাছাড়া চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ভূপৃষ্ঠস্থিত কয়েক সে. মি. গভীর মৃত্তিকাস্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মৃত্তিকা উৎপাদনের কারণ ও উপকরণগুলির প্রভাব সম্যকরূপে জানতে হলে ভূপৃষ্ঠ থেকে আদি শিলাস্তর পর্যন্ত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। প্রায় সর্বপ্রকার মৃত্তিকার উপর থেকে নিচু পর্যন্ত কয়েকটি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই মৃত্তিকাস্তরগুলির গভীরতা, মৃত্তিকার গ্রথন ও গঠন, রঙ ইত্যাদি বিভিন্ন বলে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই স্তরগুলির পরম্পরা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মৃত্তিকা উৎপাদনের কারণগুলির আনুপাতিক প্রভাবের উপর। এইজন্য স্তরবিন্যাস মৃত্তিকার উৎপত্তির একটি স্থায়ী নিদর্শনরূপে গণ্য করা হয় এবং এর ভিত্তিতেই মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর নানাদেশের মৃত্তিকার স্তরবিন্যাস এবং তাদের গুণাবলী পরীক্ষা করে একটি সুসমঞ্জস শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি উদ্ভব করা হয়েছে। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ও শ্রমলব্ধ এই পদ্ধতিটি আমেরিকার মৃত্তিকা-বিজ্ঞানীরা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেছেন। এই পদ্ধতিটির সম্যক বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এইটুকু শুধু বলা যায় যে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ নানাদেশে নানা প্রকারে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এই সকল শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি অভিজ্ঞালব্ধ এবং স্থানীয় পরিচয় ও প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই বলে সর্বত্র প্রযোজ্য বা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। আমেরিকার নূতন পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত এবং মাত্রাগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। মৃত্তিকার স্তরবিন্যাসের পরম্পরা, স্তরগুলির গভীরতা, মৃত্তিকাস্থিত জল, ক্লেদ ও জৈব অংশের পরিমাণ, মিনারেলের প্রকৃতি ও আয়ন বিনিময় ক্ষমতা জারণ-বিজারণ অবস্থা, মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব, বারিপাত এবং তাপাঙ্ক, pH, রঙ ও তার আভা এবং গাঢ়তা, এইসব কিছুর মাত্রাগত তথ্য সংগ্রহ করে শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বাবস্থায়, সর্বদেশে ক্রমশ গ্রহণীয় হবে।

মৃত্তিকা সম্পর্কে যে সব তথ্য জানানো হলো তাতে নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, মৃত্তিকা প্রকৃতই একটি জটিল বস্তুসমষ্টি। উপকরণগুলির মধ্যে মোটামুটি অজৈব সিলিকেট এবং জৈব হিউমাস প্রধান। এছাড়া এ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন অক্সাইড, বালুকা, বিভিন্ন রকমের নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাসিয়াম যৌগ ইত্যাদি মৃত্তিকার অংশে পাওয়া যায়। জল এবং বায়ু মৃত্তিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে, থাকে উদ্ভিজ্জ জীবনের প্রয়োজন মেটাতে। এই জটিল বস্তুকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডের মধ্যে নিয়ে আসা এবং একটি সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানের শাখারূপে প্রতিপন্ন করা নিঃসন্দেহে শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা। নানাদেশের বহু বিজ্ঞানীর অবিরাম কর্মসাধনার ফলে মৃত্তিকা বিজ্ঞান স্বীকৃতি লাভ করেছে। ক্রমশ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ঢিলেঢালা ভাব কেটে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, মৃত্তিকা বিজ্ঞান প্রধানত প্রায়োগিক, কিন্তু সর্বপ্রকার প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে ওঠে মৌলিক গবেষণার সহায়তায়। মৃত্তিকা সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি না থাকাতে ভিত্তি শিথিল ছিল। নূতন গবেষণার উপর নির্ভর করে এই ভিত্তি ক্রমশ দৃঢ়তর করা হয়েছে ও হচ্ছে। আর তার ফলে মৃত্তিকাভিত্তিক প্রায়োগিক শিল্পকর্ম অনেক বেশি আস্থার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে।

মৃত্তিকা পরীক্ষা ঃ

মৃত্তিকার নানা প্রয়োগ। তারমধ্যে কৃষিকর্ম অন্যতম। এই প্রবন্ধে কৃষিকর্মে মৃত্তিকার প্রয়োগবিধি আলোচনা হবে।

শস্যাদির খাদ্যবস্তু--শস্যোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর অধিকাংশই মৃত্তিকায় পাওয়া যায়। এই সকল খাদ্যবস্তুর মধ্যে নাইট্রোজেন (N), ফস্‌ফরাস (P) ও পটাসিয়াম (K) মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। এই উপাদানত্রয়ীর পারস্পরিক সম্বন্ধ এতই ঘনিষ্ঠ যে, সাধারণত এদের যুক্তভাবে NPK-রূপে লেখা হয়। ক্যালসিয়াম (Ca), সালফার (S) ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Mg)—NPK-র তুলনায় গৌণ।

এতদ্ব্যতীত বোরন (B), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), তাম্র (Cu), দস্তা (Zn), লৌহ (Fe), মলিবডেনাম (Mo) এবং ক্লোরিন (Cl)—এই সাতটি উপাদান সামান্য পরিমাণে আবশ্যক হলেও এদের অভাবে শস্যাদির স্বাস্থ্যহানি ঘটে। NPK ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলি সাধারণ মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে বলে বিশেষ অবস্থার বাইরে এদের অভাব ধরা যায় না। কোন প্রকার সার ব্যবহার না করে ক্রমান্বয়ে একই শস্য অথবা উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনের ফলে মৃত্তিকাস্থিত এই উপাদান-গুলি ক্রমশ হ্রাস পায়। উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম উৎপাদনের ফলে অনেক মৃত্তিকায় দস্তার অভাব দেখা দিয়েছে। পরিমাণের ভিত্তিতে NPK এত অধিক গৃহীত হয় যে, উপযুক্ত এবং আশাপ্রদ ফলন পেতে হলে প্রত্যেকটি ফসলের জন্যে, মূলত খাদ্যবস্তুর অভাব মেটাতে, বাইরে থেকে সার ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। এই অভাবের পরিমাণ নির্ণয় করতে মৃত্তিকা পরীক্ষণ অপরিহার্য।

অধিকমাত্রায় বৃষ্টিপাতে মৃত্তিকাস্থিত খাদ্যবস্তু ক্রমশ বহিষ্কৃত হয়ে যায়; মৃত্তিকা অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় মৃত্তিকায় বিশেষতঃ Ca ও Mg-এর অভাব ঘটে। ক্রমাগত এমোনিয়াম লবণ-সার ব্যবহারেও মৃত্তিকার অনুরূপ অম্লভাব দেখা যায়। চুন অথবা ডলোমাইট (Mg ও Ca-এর কার্বোনেট লবণ) ব্যবহার করে অম্লত্ব দূর করা উচিত, নইলে NPK প্রয়োগ সত্ত্বেও শস্যোৎপাদন ব্যাহত হয়। মৃত্তিকার pH মাপলেই অম্লত্ব ধরা পড়ে। এছাড়া অম্লত্বপ্রাপ্ত মৃত্তিকায় শস্যোৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় নানাবিধ জীবাণু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনীয় বোরন ইত্যাদি উপাদানগুলির অভাব মৃত্তিকা পরীক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করা আয়াসসাধ্য। একমাত্র সুকঠিন রাসায়নিক পদ্ধতি অথবা মূল্যবান যন্ত্রাদির সাহায্যে এই পরীক্ষণ সম্ভব। সৌভাগ্যবশত প্রকৃতি উদ্ভিদ জগতে একটি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষাগার রেখে গেছে। ঐসব উপাদানগুলির অভাবে উদ্ভিদের পাতায় অথবা কাণ্ডে নানাবিধ অসুস্থ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারফলে

পাতায় এবং কাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের এবং রঙের দাগ প্রায় দেখা যায়। সবুজ পাতায় হলুদ, তাম্রাভ কিংবা অন্য কোন রঙ প্রকাশ পেলেই বুঝতে হবে কোন না কোন উপাদানের অভাব ঘটেছে। অতএব রাসায়নিক বিশ্লেষণ না করেই কেবলমাত্র চাক্ষুষ পরীক্ষার দ্বারা মোটা-মুটি অভাব নির্ণয় করা সম্ভব।

NPK পরীক্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই উপাদানগুলির আধিক্য এবং অল্পতার পরিমাণ নির্ণয় করা এবং উপযুক্ত সার প্রয়োগে অভাব পূরণ করা। সুতরাং পরিমাণভিত্তিক বিশ্লেষণের উপরই এই পরীক্ষণের পদ্ধতিগুলি নির্ধারিত হয়েছে।

মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন ও বর্ণ—কৃষিকর্মে মৃত্তিকার উপযোগিতা বিচার করতে হলে আগে জানানো পরীক্ষণ ছাড়া কয়েকটি প্রকৃতিগত গুণের বিষয়েও জানা প্রয়োজন। এইসব গুণের মধ্যে গ্রথন, গঠন ও বর্ণ অন্যতম। মৃত্তিকা কণার অনুপাতিক আয়তনের ভিত্তিতে গ্রথন নির্ধারিত করা হয়। যেমন, আঠালো, বালুকাময়, পলি কিংবা দো-আঁশ ইত্যাদি। আঠালো মৃত্তিকায় জল নিষ্কাশন কঠিন, অথচ বালুকাময় মৃত্তিকায় জলধারণ কঠিন। কিন্তু উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত দো-আঁশ মৃত্তিকা জল নিষ্কাশন ও ধারণ বিষয়ে আদর্শ, সুতরাং কৃষিকর্মে উপযুক্ত।

মৃত্তিকাকণার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন মুখ্যত জল ও জৈব পদার্থ অথবা হিউমাস কণার প্রভাবে সম্পন্ন হয়। এই বন্ধনই মৃত্তিকার গঠন নির্ধারণ করে। মৃত্তিকা কঠিন ডেলার আকারে কিংবা ঝুরঝুরে বালির আকারে পাওয়া যাবে কিনা তা নির্ভর করে মৃত্তিকাকণাসমষ্টির মধ্যে বন্ধনের দৃঢ়তার উপর। কৃষিকর্মে উপযুক্ত মৃত্তিকার এই বন্ধন না হবে দৃঢ় না শিথিল। দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা মৃত্তিকাকণা বায়ু অথবা জল নিষ্কাশনের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বন্ধন অতি শিথিল হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালুকাময় মৃত্তিকার গুণ লাভ করে।

মৃত্তিকার বর্ণ প্রধানত লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং জৈব পদার্থের উপর

নির্ভর করে। মৃত্তিকার লাল রঙ দেখে অনুমান করা যায় অধিক বৃষ্টিপাত ও ক্রমাগত জারণের দরুণ আয়রণ অক্সাইড তৈরি হয়েছে। অতএব মৃত্তিকার ক্ষারজাতীয় বস্তুর অভাব আছে এবং সম্ভবত অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মৃত্তিকার লাল, হলুদ, ধূসর, তাম্রাভ এবং নীলাভ রঙ নির্ভর করে লৌহঘটিত যৌগের জারণের মাত্রার উপর। অক্সিজেনবর্জিত এবং সম্পূর্ণ বিজারিত অবস্থায় নীলাভ মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্ভব। জলসিক্ত কিংবা জলবৃত অবস্থায় বহুদিন ধরে বিজারিত মৃত্তিকাও নীলাভ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। জৈব পদার্থমিশ্রিত মৃত্তিকা ধূসর, গাঢ় ধূসর, বাদামী কিংবা কৃষ্ণাভবর্ণের হতে পারে। জৈব পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণের উপর রঙের আভা ও গাঢ়তা নির্ভর করে। কৃষিকর্মে কৃষ্ণাভ মৃত্তিকার গুণ সবার জানা। উচ্চ ফলনশীল শস্যের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সারের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ লাভ করতে হলে অভিজ্ঞ কৃষক বাদামী কিংবা কৃষ্ণাভ মৃত্তিকাই বেছে নেবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক গুণ বিচারে মৃত্তিকার গ্রথন, গঠন ও বর্ণ যথেষ্ট সাহায্য করে।

গবেষণাগারে গ্রথন ও গঠন নির্ধারণ পদ্ধতি যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। কিন্তু মৃত্তিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজেই গ্রথন ও গঠন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যে সামান্য পরিমাণ শুষ্ক মৃত্তিকা ঘর্ষণ করলে স্পর্শানুভূতি থেকে অনায়াসে মৃত্তিকাস্থ কণাগুলির আনুপাতিক স্থূলতা কিংবা সূক্ষ্মতা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। ঐ শুষ্ক মৃত্তিকার সঙ্গে কয়েক বিন্দু জল মিশিয়ে পুনরায় ঘর্ষণ করলে যদি আঠালো ভাব অনুভব করা যায়, তা হলে বুঝতে হবে যে, মৃত্তিকায় সূক্ষ্ম কর্দমাংশের পরিমাণ বেশী; আর যদি অল্প ঘর্ষণেই ঝুরঝুরে ভাব ফিরে আসে, তা হলে বুঝতে হবে যে, মৃত্তিকায় বালির অংশ বেশী।

আরেকটি পদ্ধতি অনুসরণ করেও অনায়াসে মৃত্তিকার গঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। একমুঠো শুষ্ক মৃত্তিকা হাতে নিয়ে সামান্য

চাপ দিলে যদি সহ জই গুঁড়ো হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, কণাগুলির মধ্যে বন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল। গুঁড়ো অংশের কণাগুলির আয়তন বালুকার মত হলে গঠন অত্যন্ত শিথিল মনে করতে হবে। কিন্তু কণাগুলি যদি 3-7 মিলিমিটার ব্যাসের হয়, তা হলে বন্ধনের দৃঢ়তা মাঝামাঝি বলে ধরে নেওয়া যায়। হাতের অল্প চাপে গুঁড়ো না হলে মৃত্তিকার একটি বড় খণ্ড নিয়ে এক মিটার উঁচু থেকে কঠিন ভূমির উপর ছেড়ে দিলে খণ্ডটি ভেঙ্গে ছোট ছোট টুক্‌রা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ঐ টুক্‌রাগুলির আয়তন ও আকার তুলনা করে মৃত্তিকাকণার পারস্পরিক বন্ধন সম্পর্কে তথা গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

NPK ও pH নির্ণয় পদ্ধতি—মৃত্তিকার উর্বরতা এবং কৃষিকর্মে উপযোগিতা মোটামুটি বিচার করতে হলে গ্রথন, গঠন ও বর্ণ ছাড়াও মৃত্তিকার অন্যান্য যে সব তথ্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, তারমধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ঃ

(1) NPK-এর লভ্য পরিমাণ ; এবং (2) pH অথবা অম্লত্বের কিংবা ক্ষারত্বের মাত্রা।

নমুনা সংগ্রহ—এসব বিশ্লেষণগুলির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে নমুনা সংগ্রহে ত্রুটি থাকলে সমগ্র বিশ্লেষণ এবং তদনুসারী পরামর্শও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। কাজেই যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নমুনা সংগ্রহ একান্ত দরকার। যে কৃষিক্ষেত্রে একই ধরনের শস্যোৎপাদন করা হয় এবং প্রায় সমতল, নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে সেই জমিকে একক বা ইউনিট বলে গণ্য করা চলে। কিন্তু উঁচু-নিচু হলে অথবা বিভিন্ন শস্যোৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হলে সুবিধার্থে জমিটি যতদূর সম্ভব ছোট ছোট ক্ষেত্রে বিভক্ত করে নিয়ে প্রত্যেকটি থেকে পৃথকভাবে নমুনা সংগ্রহ করা উচিত। মৃত্তিকা খননের জন্যে কাঠিন্য এবং আর্দ্রতা বিশেষে কোদাল, খুরপি, শাবল অথবা স্ক্রু-অগার ব্যবহার করা চলে। ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতি একরে আচমকা অন্তত 10-15টি নমুনা সংগ্রহ করা

উচিত। অথবা ক্ষেত্রটিকে মনে মনে দুটি বিপরীত কোণীয় রেখা দিয়ে ভাগ করে প্রত্যেকটি রেখা অনুসরণ করে প্রায় সমান দূরত্ব বজায় রেখে এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করে যেতে হবে, যেন প্রতি একরে অন্যূন 10-15টি নমুনা সংগৃহীত হয়। নমুনা সংগ্রহের পূর্বে নির্বাচিত স্থানটির পৃষ্ঠদেশ থেকে পাতা, ঘাস ইত্যাদি সযত্নে সরিয়ে দিতে হবে। অতঃপর উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে 15-25 সেন্টিমিটার গভীর গর্ত থেকে 0·5—1.0 কিলোগ্রাম (কেজি) মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে হবে। এইরূপে প্রতি একরে 10-15টি সংগৃহীত নমুনা উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হবে এবং একটি কাগজের উপর এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হবে যেন একটি বর্গস্থান অধিকার করে। ঐ বর্গস্থানকে চার সমান ভাগে ভাগ করে বিপরীত কোণের দুটি অংশের মৃত্তিকা রেখে দিয়ে দুটি অংশের মৃত্তিকা ফেলে দিতে হবে। রক্ষিত অংশটির দ্বারা পুনরায় অনুরূপ বর্গস্থান তৈরি করে বিপরীত কোণের দুটি অংশ রেখে অবশিষ্টাংশ ফেলে দিতে হবে। সংরক্ষিত অংশের পরিমাণ এক কিংবা দুই কিলোগ্রাম হলেই নমুনাটি রৌদ্রতাপে উত্তমরূপে শুকিয়ে 2 মিলিমিটার চালুনির সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে সূক্ষ্মতর অংশটি পরিষ্কার কাচের অথবা প্লাস্টিক পাত্রে পরবর্তী বিশ্লেষণাদির জন্য রেখে দিতে হবে। পাত্রটির ভিতরে একটি কাগজে নমুনার বিবরণ, স্থান ও নম্বর লিখে রাখতে হবে এবং বাইরে একটি কাগজে অনুরূপ তথ্যসহ একটি লেবেল এঁটে দিতে হবে। গবেষণাগারে অথবা মাঠে পরীক্ষণের জন্যে মৃত্তিকা সাধারণতঃ চামচের সাহায্যে মেপে নেওয়া হয়। বহু সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করতে গেলে ওজন করে নিতে সময় লাগে, তাই নির্ভুলতার জন্য, ওজন নিয়ে মাতামাতি না করলেও চলে। কয়েকটি বিভিন্ন আয়তনের চামচে বেছে নেওয়া হয়, যাতে পুরা এক চামচ মৃত্তিকার ওজন মোটামুটি যথাক্রমে 10.5, ·0, 5 এবং 10 গ্রাম হয়।

নাইট্রোজেন (N)—মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেন অধিকাংশই জৈব যৌগরূপে এবং অল্প পরিমাণ কর্দমাংশের সঙ্গে যুক্ত এমোনিয়াম

আয়নরূপে থাকে। উদ্ভিদ নাইট্রেট রূপে নাইট্রোজেন আহরণ করে, কিন্তু তার পরিমাণ যেমন সমান, অবস্থিতিও তেমনি সাময়িক। মৃত্তিকার নাইট্রোজেন নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত।

(1) **কার্বন নির্ণয় পদ্ধতি—** এই পদ্ধতিটি পরোক্ষ। কার্বন নির্ণয় করবার জন্যে এক গ্রাম মৃত্তিকার নমুনা চামচের সাহায্যে মেপে 500 মিলিলিটার (সংক্ষেপে মি. লি) একটি কোণীয় পাত্রে রাখা হলো। অতঃপর অল্প পরিমাণ $Ag_2\ SO_4$, 10 মি. লি. 1.0 $NK_2Cr_2O_7$ দ্রবসহ 20 মি. লি. গাঢ় সালফিউরিক অম্ল ঐ পাত্রে ঢেলে দেওয়া হলো। উত্তমরূপে মিশ্রণের পর বিক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে 30 মিনিট সময় দেবার পর 200 মি. লি. জল, 100 মি. লি. ফস্‌ফরিক অম্ল, 10 মি. লি. NaF ও 2 মি. লি. ডাইফেনিল এমিন সূচক পাত্রের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হলো। পাত্রের মধ্যে বাড়তি $K_2Cr_2O_7$ মানক $FeSO_4$ দ্রবের দ্বারা টাইট্রেশন করা হলো। পাত্রের দ্রবের রঙ উজ্জ্বল সবুজ বর্ণে রূপান্তরিত হলেই বুঝতে হবে যে, টাইট্রেশন সম্পূর্ণ হয়েছে।

হিসাব ঃ

$$N = 67{\cdot}20 \times \frac{\{(\text{মৃত্তিকা ব্যতীত ব্যবহৃত } FeSO_4 \text{ দ্রবের পরিমাণ}) - (\text{মৃত্তিকাসহ ব্যবহৃত } FeSO_4 \text{ দ্রব্যের পরিমাণ})\}}{(\text{মৃত্তিকা ব্যতীত ব্যবহৃত } FeSO_4 \text{ দ্রবের পরিমাণ})} \text{ কেজি/হেক্টর}$$

ব্যবহৃত দ্রব্যাদির প্রস্তুত প্রণালী—(ক) মানক 1.0 $NK_2Cr_2O_7$— 1000 মি. লি. জলে 49.04 গ্রাম বিশুদ্ধ $K_2Cr_2O_7$ (খ) মানক 0.5N $FeSO_4$—196.1 গ্রাম $Fe(NH_4)_2\ (SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ 20 মি. লি. গাঢ় H_2SO_4 সহ 800 মি. লি. জলে দ্রবণান্তে এক লিটারের বাকী অংশ জল দিয়ে পূরণ। (গ) ডাইফেনিল এমিন সূচক— 20 মি. লি. জল এবং 100 মি. লি. গাঢ় H_2SO_4-এর মিশ্রণে 0·5

গ্রাম ডাইফেনিল এমিন। (ঘ) 85 শতাংশ H_3PO_4 দ্রব। (ঙ) 96 শতাংশ H_2SO_4 + 1·25 শতাংশ Ag_2SO_4 দ্রব। (চ) 2 শতাংশ NaF দ্রব।

(2) **ক্ষারীয় পারম্যাঙ্গানেট পদ্ধতি**—20 গ্রাম মৃত্তিকার নমুনা এক লিটার পাত্রে 20 মি· লি· জল ও তৎসহ 100 মি· লি. 0.32 শতাংশ $KMnO_4$ এবং 100 মি. লি. 2.5 শতাংশ NaOH ঢেলে দেওয়া হলো। শেষোক্ত দ্রব দুটি সদ্যপ্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাত্রের মিশ্রণটি ভাল করে ঊর্ধ্বপাতিত করবার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত এমোনিয়া 25 মি. লি. N/50 সালফিউরিক অম্ল দ্রবে সঞ্চারিত করা হলো। তারপর বাড়তি অম্ল দ্রব মেথিল অরেঞ্জ সূচক সহযোগে মানক N/50 NaOH দিয়ে প্রশমিত করা হলো।

হিসাব : বাড়তি অম্ল দ্রব করতে 'ক' মি. লি. NaOH প্রয়োজন হলে,

N = 3·13 × (25-ক) কেজি / হেক্টর

ফসফরাস (P) - মৃত্তিকার pH-এর উপর P-এর প্রাপ্তি নির্ভর করে। এইজন্যে অম্ল (pH 7-এর কম) এবং প্রশমিত/ক্ষারীয় (pH 7/ততোধিক) মৃত্তিকার P নির্ণয়ের জন্য দুই-রকম পদ্ধতি প্রচলিত। প্রথমোক্ত মৃত্তিকাস্থিত লভ্য P নির্ণয়ের জন্যে ব্রে 1 (Bray 1) ও দ্বিতীয়োক্ত মৃত্তিকার জন্য ওলসেন (Olsen) পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

ব্রে (1) পদ্ধতি—5 গ্রাম মৃত্তিকার নমুনার মধ্যে 103 মি· লি. একটি কোণীয় পাত্রে 60 মি লি ব্রে 1 দ্রব ঢেলে দেওয়া হলো। পাঁচ মিনিট ঝাঁকাবার পর ছেঁকে নিয়ে পরিশ্রুত দ্রব থেকে 5 মি. লি. তুলে একটি 25 মি. লি· পরিমিত পাত্রে রাখা হলো। অতঃপর তন্মধ্যে 5 মি· লি মলিবডেট বিকারক 10 মি· লি. জল ঢেলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হলো। 1.0 মি· লি; $SnCl_2$ দ্রব ঢালবার পর বাকি অংশ জল দিয়ে পুরো 25 মি· লি· করা হলো। দ্রবের নীল রঙ বর্ণপরিমাপক

যন্ত্রের সাহায্যে অথবা খালি চোখে মাপা যায়। বর্ণপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে পৃথকভাবে প্রস্তুত মানক রৈখিক চিত্রের সঙ্গে তুলনা করে P-এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। অথবা বিভিন্ন পরিমাণ P-এর উপস্থিতিতে প্রস্তুত কয়েকটি পরীক্ষানলে স্থিত নীলবর্ণ দ্রব্যের সঙ্গে চাক্ষুষ তুলনা করেও অজানা নমুনাটি P-এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

তুলনার জন্যে মানক দ্রব্যাদি ও রৈখিক চিত্রের প্রস্তুতি— 0·1916 গ্রাম বিশুদ্ধ KH_2PO একটি 1·0 লিটার পাত্রে জলে দ্রবণ করে এক বিন্দু টল্যুইন দেওয়া হলো। (টল্যুইন অক্সিজেন প্রবেশ রোধ করে পরোক্ষভাবে জীবাণু নাশকের কাজ করে)। এই দ্রব থেকে 10 মি. লি. নিয়ে বাকি পরিমাণ জল মিশিয়ে 10 লিটারে পরিণত করলে প্রস্তুত দ্রব্যের প্রতি মি. লি.-তে 10 মাইক্রোগ্রাম (10^{-6} গ্রাম) P_2O_5 থাকে। এগারোটি 25 মি· লি· পাত্রে শূন্য থেকে 10 মি. লি. শেষোক্ত দ্রব রাখা হলো। প্রত্যেকটিতে 5 মি লি.-রে i দ্রব, 5 মি লি. মলিবডেট দ্রব এবং বাকি অংশ জল দিয়ে আন্দাজ 20 মি. লি. করা হলো। অতঃপর 10 মি. লি. $SnCl_2$ দ্রব মিশিয়ে জল দিয়ে পুরো 25 মি লি করা হলো। বিক্রিয়া সমাপ্ত হতে দশ মিনিট সময় দিয়ে প্রত্যেকটি পাত্রের নীল রঙ বর্ণমাপক যন্ত্রে মাপা হলো। বস্তুত যন্ত্রের নির্দেশক মিটারে চিহ্নিত সংখ্যাগুলি লিপিবদ্ধ করা হলো পরিশেষে প্রত্যেকটি পাত্রের P_2O_5 পরিমাণ (শূন্য থেকে 10 মাইক্রোগ্রাম) এবং মিটারের সংখ্যাগুলি নিয়ে একটি গ্রাফ আঁকা হলো। এই গ্রাফের সরল রৈখিক অংশের উপর ভিত্তি করে মানক রৈখিক চিত্রটি প্রস্তুত করা হয়। যদি কোন অজানা নমুনা নিয়ে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত নীল রঙ বর্ণমাপক যন্ত্রে মাপা যায়, তাহলে উল্লিখিত মানক রৈখিক চিত্র থেকে অনায়াসে অজানা নমুনার P_2O_5-এর পরিমাণ জানা যায়। যন্ত্রের অভাবে চাক্ষুষ তুলনার পথেও মোটামুটি পরিমাণ জানা সম্ভব।

হিসাব : নমুনাটিতে 'ক' মাইক্রোগ্রাম P_2O_5 পাওয়া গেলে

উল্লিখিত অনুপাত অনুসারে মৃত্তিকায় 4·48 × কেজি/হেক্টার P_2O_5 লভ্য অবস্থায় রয়েছে।

ব্যবহৃত দ্রবাদির প্রস্তুত-প্রণালী—(ক) ব্রে 1—2·22 গ্রাম NH_4F 20 মি লি জলে গলিয়ে ছাঁকা হলো এবং পরিস্রুত দ্রবের মধ্যে 4 মি· লি. গাঢ় HCl ঢালা হলো। অতঃপর বিশুদ্ধ জল দিয়ে দুই লিটার করা হলো।

(খ) 15 গ্রাম $(NH_4)_2$ MoO_4 300 মি· লি. জলে গলিয়ে 350 মি. লি. 10N HCl-এ অল্প পরিমাণে ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে নাড়া হলো। অতঃপর জল দিয়ে পুরা এক লিটার করা হলো।

(গ) 10 গ্রাম $SnCl_2$ $2H_2O$ 25 মি. লি. গাঢ় HCl-এ দ্রবণ করিয়ে এক টুক্‌রা ধাতব টিন রেখে দেওয়া হলো। এই সংরক্ষিত দ্রব থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার জন্যে এক মি. লি. নিয়ে 66 মি. লি. জলে মিশিয়ে সদ্য প্রস্তুত অবস্থায় ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

ওল্‌সেন পদ্ধতি—2·5 গ্রাম মৃত্তিকার নমুনা একটি 100 মি. লি· কোণীয় পাত্রে নিয়ে তার মধ্যে 50 মি· লি. সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দ্রব ঢেলে দেওয়া হলো। এক গ্রাম সক্রিয় অঙ্গার ঐ পাত্রে ফেলে দিয়ে সমগ্র মিশ্রণটি আধ ঘণ্টা ধরে ঝাঁকানো হলো। এরপর ছেঁকে নিয়ে পরিস্রুত দ্রব থেকে উপরোক্ত ব্রে পদ্ধতি অনুসারে মলিবডেট ও স্ট্যানাস ক্লোরাইড দ্রবাদি সহযোগে নীল বর্ণের দ্রব সৃষ্টি করা হয়। তারপর ব্রে পদ্ধতির অনুরূপ বর্ণমাপক যন্ত্রের সাহায্যে অথবা চাক্ষুষ তুলনার দ্বারা P_2O_5-এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

হিসাব: নমুনাটিতে 'ক' মাইক্রোগ্রাম P_2O_5 পাওয়া গেলে উল্লিখিত অনুপাত অনুসারে মৃত্তিকায় 8·96 × ক কেজি/হেক্টার P_2O_5 লভ্য অবস্থায় রয়েছে।

ব্যবহৃত দ্রবাদির প্রস্তুত-প্রণালী—(ক) ওল্‌সেন বিকারক—34 গ্রাম $NaHCO^3$ দুই লিটার জলে গলিয়ে HCl অথবা NaOH সহযোগে pH8·5-এ নির্দিষ্ট করা হয়। অধঃক্ষেপ থাকলে পরিস্রাবণ বাঞ্ছনীয়।

(খ) সক্রিয় অঙ্গার—ব্যবহারের পূর্বে উপরিউক্ত ওল্‌সেন বিকারকের সাহায্যে ফস্‌ফরাস যৌগ থেকে মুক্ত করে নিতে হবে।

(গ) মলিবডেট বিকারক—ব্রে পদ্ধতিতে উল্লিখিত প্রণালীমতে প্রস্তুত, কিন্তু 350 মি লি-র পরিবর্তে 400 মি. লি. 10NHCl ব্যবহার্য।

(ঘ) $SnCl_2$ দ্রব—ব্রে পদ্ধতিতে ব্যবহৃত দ্রবের অনুরূপ। মানক রৈখিক চিত্রটির নির্ভুলতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ভুল ধরা পড়লে চিত্রটি পুনরায় প্রস্তুত করে নিতে হয়।

পটাসিয়াম (K)—(1) 5 গ্রাম মৃত্তিকার নমুনা 25 মি. লি. প্রশমিত 1·0N এমোনিয়াম এসিটেট দ্রবের সঙ্গে মিশিয়ে পাঁচ মিনিট ঝাঁকিয়ে ছেঁকে নেওয়া হলো। পরিস্রুত দ্রবের মধ্যে দুই বিন্দু ব্যুটিল এলকোহল মিশিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর ফ্রেম ফোটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

হিসাব : যন্ত্রে 'ক' মাইক্রোগ্রাম লিপিবদ্ধ হলে উপরিউক্ত অনুপাত অনুসারে K-র পরিমাণ = 10 × ক কেজি/হেক্টার।

(2) একটি 100 মি লি. পাত্রে 5 গ্রাম মৃত্তিকা নমুনার সঙ্গে 25 মি. লি. সোডিয়াম এসিটেট-এসেটিক অম্ল বাফার (pH4·8) ঢেলে দেওয়া হলো। পাঁচ মিনিট উত্তমরূপে ঝাঁকানির পর ছেঁকে নেওয়া হলো। পরিস্রুত দ্রব পটাসিয়াম নির্ণয়ের জন্যে পৃথক রাখা হলো। একটি পরীক্ষা নলের ভিতর 2 মি. লি. মেথিল এলকোহল ও আইসোপ্রোপিল এলকোহল মিশ্রণ নেওয়া হলো; তাতে 6 বিন্দু সোডিয়াম কোবাল্ট নাইট্রাইট দেওয়া হলো। অল্প ঝাঁকানির পর প্রাপ্ত স্বচ্ছ দ্রবের সঙ্গে 2 মি. লি. পটাসিয়াম দ্রব (মৃত্তিকার নমুনা থেকে প্রাপ্ত) একটি সিরিঞ্জের (ইনজেক্‌সনে ব্যবহার্য,) সাহায্যে মিশিয়ে দেওয়া হলো। তারপর নলটি খুব জোরে আধ মিনিট ধরে ঝাঁকানো হলো। এই পদ্ধতিতে হলুদবর্ণের একটি অস্বচ্ছ মিশ্রণ পাওয়া গেল। পটাসিয়ামের পরিমাণের উপর অস্বচ্ছতার মাত্রা নির্ভর করে।

বর্ণমাপক যন্ত্রের সাহায্যে অথবা চাক্ষুষ তুলনায় অস্বচ্ছতার মাত্রা নির্ণয় করা যায়। একটি মানক রৈখিক চিত্র এঁকে যে কোন অজানা নমুনার পটাসিয়াম পরিমাপ করা যায়। পটাসিয়াম নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুসরণকালে ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব ও বিকারকের তাপ-মাত্রা 15-19° সেন্টিগ্রেড রাখা একান্ত দরকার।

হিসাব : চিত্রের সাহায্যে অথবা চাক্ষুষ তুলনার দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণ 'ক' হলে মৃত্তিকাস্থিত পটাসিয়ামের লভ্য পরিমাণ হবে ক × 5·6 কে জি/হেক্টার।

ব্যবহৃত দ্রবাদির প্রস্তুত-প্রণালী—(ক) সোডিয়াম এসিটেট—এসিটিক অম্ল 100 বাফার (pH4·8) অথবা মর্গ্যান বিকারক : 100 গ্রাম সোডিয়াম এসিটেট ও 30 মি. লি. গ্লেসিয়াল এসেটিক অম্ল মিশিয়ে বাকিটা জল দিয়ে এক লিটার পূর্ণ করলেই মর্গ্যান বিকারক প্রস্তুত হয়।

খ) সোডিয়াম কোবাল্টি নাইট্রাইট দ্রব 50 গ্রাম CO $(NO_3)_2$, $6H_2O$ + 300 গ্রাম $NaNO_2$ + 25 মি. লি. গ্লেসিয়াল এসেটিক অম্ল এক লিটার জলে উত্তমরূপে মিশিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও আলোহীন স্থানে রাখা বাঞ্ছনীয়।

(গ) এলকোহল মিশ্রণ—সমপরিমাণ বিশুদ্ধ মেথিল ও আইসোপ্রোপিল এলকোহল।

(ঘ) মানক চিত্র প্রস্তুতের জন্যে KCl দ্রব— 1·5851 গ্রাম বিশুদ্ধ KCl এক লিটার জলে দ্রবণ করে প্রতি মি. লি. দ্রবে মিলিগ্রাম KCl থাকবে।

PH নির্ণয় পদ্ধতি—10 গ্রাম মৃত্তিকার নমুনা + 0·5 $BaSO_4$ (এক্স-রে কার্যে ব্যবহৃত হয় এমনি বিশুদ্ধতাসম্পন্ন) + 25 মি. লি. জল + দশ বিন্দু সূচক দিয়ে একটি পরীক্ষা-নলে আধ ঘণ্টা ধরে মাঝে মাঝে ঝাঁকানো হলো। কিছুক্ষণ পরে $BaSO_4$ সমেত মৃত্তিকা থিতিয়ে পড়বে। ছেঁকে নিয়ে পরিস্রুত রঙীন দ্রব পৃথক রাখা হলো। ঐ একই পদ্ধতিতে

বিভিন্ন pH সম্পন্ন বাফার দ্রবের মধ্যে ঐ সূচক দ্রবের দশ বিন্দু মিশিয়ে দেওয়া হলো। সূচকমিশ্রিত মৃত্তিকার নমুনা থেকে প্রাপ্ত রঙ কোন্ বাফারের রঙের সঙ্গে মিশে যায়, তা যাচাই করে দেখা হলো। তাহলে সেই বাফারের ও মৃত্তিকার pH এক। বাফার এবং সূচক নির্বাচন করতে এবং এদের প্রস্তুত-প্রণালীর জন্যে কোন রসায়ন পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য নিতে হবে।

pH 7-এর কম হলে মৃত্তিকা অম্লাত্মক এবং 7-এর অধিক হলে ক্ষারীয়। pH 6·8 থেকে 7·2 পর্যন্ত হলে অম্লত্ব কিংবা ক্ষারত্ব এত কম যে, কোন প্রকার প্রশমনের প্রয়োজন হয় না। pH 6·8 এর কম হলেই উপযুক্ত পরিমাণ চুন প্রয়োগ করে pH 7-এর কাছাকাছি বাড়িয়ে দিতে হবে, নতুবা মৃত্তিকার সাধারণ উর্বরাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তেমনি pH 7·2-এর অধিক হলে হয় জিপ্‌সাম অথবা অম্লভাবাপন্ন কোন রাসায়নিক দ্রব্য (যথা গন্ধক কিংবা হিউমাস অম্ল) প্রয়োগ করে ক্ষারত্ব প্রশমন করতে হবে।

NPK পরিমাণ নির্ণয় এবং সার প্রয়োগ-সমস্যা—NPK বিশ্লেষণ করলেই মৃত্তিকার উর্বরতা অথবা শস্যোৎপাদনের জন্যে এই খাদ্যবস্তুগুলির অল্পতা কিংবা আধিক্য ধরা যায় না। উর্বরতা সম্পর্কে সম্যক তথ্য জানতে হলে NPK ছাড়াও মৃত্তিকার শস্যোৎপাদন ক্ষমতা এবং সার প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফলাফল জানা আবশ্যক। খাদ্যবস্তুর অভাব প্রচুর থাকলে সার প্রয়োগে ফলন প্রচুর বাড়ে। নতুবা অভাব মাঝারি হলে ফলন বৃদ্ধিও মাঝারি হবে। কিন্তু যথেষ্ট খাদ্যবস্তুর উপস্থিতিতে সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি সামান্যই হবে। কাজেই বিভিন্ন পরিমাণ সার প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধির পরিমাণের সঙ্গে মৃত্তিকাস্থিত NPK-এর পরিমাণ তুলনা করে অধম, মধ্যম ও উত্তম—এই তিনভাগে মৃত্তিকার নমুনাগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে। মৃত্তিকা বিশ্লেষণের পর খাদ্যবস্তুর কম-বেশী তুলনা করে কোন্ কোন্ সার কত পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে সহজেই তার একটি মোটামুটি হিসাব করা সম্ভব। সার প্রয়োগ

করে, পরীক্ষালব্ধ ফলনের উপর নির্ভর করে, এই হিসাব পাকাপাকি করা যায়। স্বীকার করতেই হবে যে, NPK-এর পরিমাণ মৃত্তিকার উর্বরতার মাত্র একটি দিকেরই সন্ধান দিতে পারে। সুতরাং সামগ্রিক চিত্রটি জানতে হলে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে গ্রথন, গঠন, বর্ণ ছাড়াও জানতে হয় সারের সঙ্গে মৃত্তিকার বিক্রিয়া। সার প্রয়োগ করে শস্যোৎপাদন পরীক্ষার ভিত্তিতে এই সব বিক্রিয়ার একটি সামগ্রিক চিত্র সূচিত হয়। এই জন্যেই সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধিসম্পর্কিত তথ্য অত্যাবশ্যক।

মৃত্তিকা পরীক্ষণের বর্তমান ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি—1955 সালে প্রথম দেশের বিভিন্ন স্থানে 24টি মৃত্তিকা পরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রগুলি ভারত সরকার ও আমেরিকার টি. সি. এম্ অনুষ্ঠানের যুগ্ম তত্ত্বাবধানে কার্যকরী হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারও প্রয়োজনানুসারে অনুরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এতদ্ব্যতীত সার কারখানাগুলিও নিজস্ব প্রস্তুত সারের বিক্রয় বৃদ্ধির সুবিধার্থে মৃত্তিকা পরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। রাজ্য মার্কেটিং ফেডারেশনগুলিও ক্রমশ মৃত্তিকা পরীক্ষণ কার্যে এগিয়ে আসে। এক একটি কেন্দ্র বছরে অন্যূন দশ হাজার নমুনা পরীক্ষা করতে পারে। আই. এ ডি. পি. কর্মসূচীতে মৃত্তিকা পরীক্ষণের কাজ এতই জরুরী মনে হয়েছিল যে, সেইজন্য নয়টি প্রমাণ পরীক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হলো ; প্রতি কেন্দ্রের বার্ষিক নমুনা পরীক্ষণ ক্ষমতাও ত্রিশ হাজারে উন্নীত করা হলো। মৃত্তিকা পরীক্ষণ কার্য যাতে কৃষকের জমিতে উপস্থিত থেকে করা যায়, তার জন্যে ক্রমশ ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বর্তমানে 186টি ভারত ও রাজ্য সরকার পরিচালিত, 49টি সারশিল্প ও ব্যবসায়ী পরিচালিত মৃত্তিকা পরীক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের সংখ্যা 15, তন্মধ্যে তিনটি মাত্র বেসরকারী। 235টি কেন্দ্রে বছরে ত্রিশ লক্ষের উপর মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজন অনুপাতে সুবিধা অপ্রচুর সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় যে, আংশিক যন্ত্রাদি বিকল হবার জন্যে এবং আংশিক বিজলী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির অভাবের জন্যে পরীক্ষণ

কেন্দ্রগুলি, একমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীর ব্যতীত অন্য সব জায়গায় মাত্র 30 থেকে 48 শতাংশ কার্যকরী অবস্থায় রয়েছে।

[এই প্রবন্ধের ১০৬ পৃষ্ঠায় ৩নং চিত্রের বাঁ দিকে বালি দোআঁশ স্থানে পলি দোআঁশ হবে।]

শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়

(১)

জাহির বিজ্ঞান সংসদের সভ্যরা এই সংসদের বক্তৃতামালায় চতুর্থ বক্তৃতা দিতে ডেকে আমাকে যে সম্মানিত করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার নিজেরই সন্দেহ থাকে, তাঁরা যে গুরুভার আমাকে দিয়েছেন তা বহন করার শক্তি আমার সত্যি আছে কি? জাহির বিজ্ঞান সংসদের নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য আছে। আমার বক্তব্য প্রকাশে যদি এই লক্ষ্যলাভের ক্ষেত্রে সামান্যতম পদক্ষেপ হয় তবে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

এ ভাষণ দিতে এসে আমার যে লাভ হয়েছে তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত; কারণ ডঃ জাহির যখন সাইনটেফিক ওয়ার্কারের এসোসিয়েশনটি সমগ্র ভারতে স্থাপন ও প্রচারের চেষ্টা করছিলেন তখন আমি ছিলাম বয়সে ছোট এবং সেই সময়ে ডঃ জাহিরের যে ব্যক্তিত্ব, কর্মকুশলতা দেখেছি তাতে আমি অভিভূত। সেই ডঃ জাহিরের নামে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কাছাকাছি এসে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে করছি। আমি ডঃ জাহিরের

ব্যক্তিত্ব, মমতা ও নেতৃত্ব দেখেছি তাকে আমি নিজের জীবনে পাথেয় বলে স্বীকার করি, কারণ তিনি নিজে বিরাট বিজ্ঞানী হয়েও শুষ্ক বিজ্ঞানের গজদন্ত মিনারে বাস না করে কী করে বিজ্ঞানকে দেশের, দশের ও আপামর জনসাধারণের উন্নতির জন্য লাগানো যায় তার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর জন্ম-দিনের শুভলগ্নে এই সব্যসাচীকে স্মরণ করে তাঁর জীবনাদর্শ থেকে আমরা উচ্চশিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে নানা জ্ঞানালোকে উজ্জীবিত হয়ে, শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নিশানা হয়তো পেতে পারি।

(২)

নিঃশ্বাসের মতই মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে শিক্ষা। যতদিন বাঁচি ততদিনই শিখি। যত বাঁচি তত বুঝি এই বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে আমরা নিতান্তই অকিঞ্চন। শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন সীমা নেই তা সবারই জানা—তবু শিক্ষাদানের পদ্ধতি বস্তুত পৃথিবীতে সর্বত্রই এক। তার একটা নির্দিষ্ট স্তর আছে। বিরাট পিরামিডের নীচে আছে বিশাল প্রাথমিক ভিত্তি, তারপর স্কুল, কলেজ আর উপরের শীর্ষবিন্দুতে আছে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিটি স্তর যেন একসূত্রে গাঁথা। কোথাও কোন আকস্মিক অনাবশ্যক পরিবর্তন করতে গেলে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়, শিক্ষার্থীর মনের উন্মেষের পথে দেখা দেয় বাধা-বন্ধন। প্রাথমিক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিপূরক এবং এই পরস্পর নির্ভর-শীলতার উপর গড়ে ওঠে জ্ঞানের সৌধ, বিজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ বিহার।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হয়তো নানান ভাবে গঠিত, ভিন্ন উপায়ে পরিচালিত। তবুও মূল উদেশ্য এক ও অভিন্ন ; তা মূলত শিক্ষার প্রসার চিন্তার ব্যাপ্তি। এই বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বিশ্ববিদ্যা চর্চার কেন্দ্রভূমি তেমনি আবার তথাকথিত খণ্ড-বিখণ্ড বিশ্ব-মানবিকতার মধ্যে অখণ্ড সত্ত্বার উন্মেষের এক ক্ষেত্রভূমি। মানবতার আপাত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মানবাত্মার

অচ্ছেদ্য মূল সুরকে সন্ধান করার জন্য, দেশে দেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অতীতকে খুঁজে পেতে চায়, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করে আর ভবিষ্যতের সঠিক দিগনির্দেশ করে চিরকালই এক অপরূপ সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠে। এই সৃষ্টির মূল কথা জয় নয়, লাভ নয়—এই সৃষ্টিকে মাপা যায় না। কিন্তু এই সৃষ্টির বিস্ময়কর উদ্দেশ্য একটা, মানুষের গতি-অগ্রগতির মাঝে মানুষের শক্তির কলধ্বনি তোলা। মানুষের আদর্শবাদ, মানুষের অগ্রগতির মূল্যায়ন, আত্মিক শক্তির বিকাশ, সব ভেদাভেদের উপরে অফুরন্ত সত্যের হিরণ্ময় আলোকের সন্ধান ; প্রশ্নের জিজ্ঞাসা, উত্তরের অন্বেষণ—সব নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চিরকালের জ্ঞানের তীর্থভূমি।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা এই উচ্চ আদর্শবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করতে কি পেরেছি? অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল স্বরূপ কি? আজকে আমরা দেখি, জ্ঞানচর্চার বদলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজনৈতিক শ্লোগানে মুখরিত, যুক্তি-তর্ক-সত্য জ্ঞান-অন্বেষণ সেখান থেকে নির্বাসিত। এই অবস্থায় পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাঁচবার চেষ্টায় অস্থির আর নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন কোন আদর্শবাদ না খুঁজে পেয়ে এক অস্বাভাবিক অস্থিরতার মধ্যে নিমজ্জমান। বহু ধরনের সংস্থাকে আজ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দেওয়া হচ্ছে অথচ এখানে না হয় বিশ্ববিদ্যার চর্চা, না হয় নতুন জীবনের বা জ্ঞানের সন্ধান। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশেষজ্ঞ' তৈরি করা হয়—বিশেষজ্ঞরা এতই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী যে, অসীম বিশ্ববিদ্যার চর্চা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞ তৈরি করার নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্য-জ্ঞানের চর্চাকে চিরকালের জন্য আমরা সজ্ঞানে বিতারিত করেছি।

হয়তো এর কারণ অনেক। মনে হয় অন্যতম প্রধান কারণ, ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি—যাকে আকস্মিক ছাত্র স্ফিতিও বলা যায়। ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে একদিকে শিক্ষা পঠন-পাঠনের গুণগত উৎকর্ষতা কমেছে অন্যদিকে বেড়েছে শিক্ষার মূল্যবোধেব অবক্ষয়। শিক্ষাস্থানে দাঁড়িয়েছে

যেন-তেন-প্রকারেন ডিগ্রী পাওয়া। ডিগ্রী পাওয়ার অর্থ চাকরীর বাজারে কিঞ্চিত সুবিধা। চাকরীর সঙ্গে ডিগ্রীর সম্পর্ক ছিন্ন না করতে পারায় অসংখ্য ছাত্র উচ্চ-শিক্ষার জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে, যারা এই উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত নয়। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক মূল্যায়ন যেভাবে জড়িয়ে আছে সহজে সেখান থেকে শুদ্ধ জ্ঞান-চর্চার আলোক মুক্তি পাচ্ছে না। সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন না হওয়ার ফলে আজ উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এক কুশ্রী প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় যা বিনষ্ট হয়েছে তা শিক্ষার মান।

হয়তো শিক্ষার মানের অবনমনরোধ করা যেত, যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হতো স্কুল স্তর থেকে। কিন্তু বৃত্তিমূলক স্কুল সে সাফল্য লাভ করে নি। তার কারণ ডিগ্রীর মোহ আর ডিগ্রীর সঙ্গে চাকরীর অনিবার্য সংযোগ।

এ কথা আমরা জানি, যত সহজে ডিগ্রী পাওয়া যায়, তত সহজে ডিগ্রীর উপযুক্ত কাজ সৃষ্টি হয় না। তাই ডিগ্রীধারীরা উপযুক্ত কাজ না পেয়ে সামাজিক শৃঙ্খলাকে ক্রমশ অসুস্থ করে চলেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় চাকরী পাবার বা দেবার অফিস কখনই হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ নিরলস জ্ঞানের সাধনা। কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করে আজ বিশ্ববিদ্যালয় মূলত ডিগ্রী বেচার প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শিক্ষার মান যচ্ছে দ্রুত নেমে আর যে সব ছাত্ররা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভীড় করেছে তারা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দোষ চাপাচ্ছে। তাদের মানসিক বৈকল্য মেটানোর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় চাকুরী লোভী ছাত্রদের আক্রোশের লক্ষ্য। এ এক অদ্ভুত অবস্থা—যে অবস্থা থেকে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যে হারে ব্যাঙের ছাতার মতো বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠছে, যে হারে মূল্য-হীন বা নীচুমানের ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিলি করা হচ্ছে, সেই হারে চাকরীর সুযোগ বাড়ে নি এবং সহজে তা বাড়বে না। হয়তো

এটিই ভারতের একমাত্র সমস্যা নয়। সমস্ত বিশ্বজুড়েই দেখা যায় একই প্যাটার্ন। হয়তো এই প্যাটার্ন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নানান "মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের" কথা চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হয় নি, বরং সমস্যা আরও বেড়েছে।

কখনও বলা হচ্ছে, 'জাতীয় উন্নতি' শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু "উন্নতি" বলতে ঠিক কি বোঝায় আমাদের কাছে তা পরিষ্কার নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে কখনো ভাবা হচ্ছে ফ্যাক্টরীর মতো। ফ্যাক্টরী বাড়ালে চাকরী বাড়ে। অতএব সমান্তরাল হিসেবে ভাবা হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ালেই স্থানীয় উন্নতি হবে।

কোন দিন আমরা ভেবেও দেখছি না যে, স্থানীয় উন্নতি এই ধরণের নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। আমরা কি ভেবে দেখেছি ফ্যাক্টরীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা চলে? না বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢুকবার একমাত্র ইচ্ছা চাকরী পাওয়া? তাই চাকরী পাবার নেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অসংখ্য ছাত্রের ভীড়। তা ছাড়া ফ্যাক্টরীর তুলনায় স্কুল-কলেজের খরচও কম। ফলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অগণ্য। কিন্তু ডিগ্রীধারীরা চাকরী পায় না। আর চাকরী পায় না বলেই জ্ঞানের তৃষ্ণা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়েই যদি জ্ঞানের প্রকাশ না থাকে তবে তা 'আধুনিক' হতে পারে কিন্তু জ্ঞানের ভাণ্ডারী হয় না।

ছাত্রদের দোষের দায়ভাগী করা হচ্ছে। 'আজকের তরুণরা বিলাস ভালবাসে। তাদের ব্যবহার অশালীন, সব কিছু তুচ্ছ করার প্রবৃত্তি এদের। বয়স্কদের সম্মান দিতে চায় না। গুরুজনরা ঘরে এলে তারা দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানায় না। পিতামাতার বিরোধিতা অথবা শিক্ষকদের উপর অত্যাচার—এ সব এদের কাছে স্বাভাবিক।" এই কথাগুলি বর্তমানের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের নয়। খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশ অব্দে সক্রেটিস এই উক্তি করেছিলেন—যখন গ্রীক সভ্যতা তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেছিল। তরুণরা চিরকালই কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নি। তারুণ্য মানে প্রতিবাদ-হঠকারিতা-বিরোধিতা: তবুও

তারুণ্য দায়িত্বহীনতা নয়। তরুণরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার পথে যুক্তি বিচার মেনে নিতে পারে। তাই ছাত্রদের বিচার করার আগে তারুণ্যকে যেমন মেনে নিতে হবে তেমনি ভাবতে হবে তাদের ভবিষ্যতের কথা, তাদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তৈরি করা, তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। এই দায়িত্ব যে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকদের উপর কিছুটা বর্তায় তাতে সন্দেহ থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য কি? এই প্রসঙ্গে আর. পি. ডোর বলেছেন, 'জ্ঞানের বিকাশ, জ্ঞান বিতরণ, তথ্য-তত্ত্বের সুসঙ্গত বাছাই, মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, মানসিক উন্নতি, অবাঞ্ছিত অহেতুককে কাট-ছাঁট করে বিদায়, জাতীয় বিকাশের পথ সুগম, সামাজিক সুষম-শৃঙ্খলার বিধান, সমালোচনাকে মূল্য দেওয়া—এই সব হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। আজকের দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে এর কটা উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করেছে? এই প্রশ্ন তোলা যায়, এই প্রশ্ন থাকে।

এক কথায় হয়তো বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি করা। ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি করার ব্রত থেকে আমরা কতদূর যে বিচ্যুত হয়েছি তাতো সবার জানা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত লোভ-লালসাকে বাড়িয়ে দিয়ে, সমাজকে বঞ্চনা করেছি। উপচিকীর্ষা ভবিষ্যতের নাগরিক তৈরি না করে কিছু ডিগ্রীধারী অসামাজিক উঁচু নাক, গর্বিত মদোদ্ধত নাগরিক তৈরি করে যাচ্ছি— যারা গ্রাম-ভারতকে অবহেলা করেছে, গ্রামের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করেছে, গ্রামের মানুষকে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে শহরের ভীড়-আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ডিগ্রীর এমনই মহিমা যে, মানুষকে সামাজিক হবার সুযোগ না দিয়ে তাকে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান গোষ্ঠীর অন্যতম করে অসামাজিকতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। গ্রামীণ ভারতকে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সত্যই সাহায্য করতে কি পারে? এটি দুর্দম প্রশ্ন, যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামের উন্নতি পরোক্ষভাবে করতে পারে যদি গ্রামের

স্কুল ভাল হয়। কিন্তু গ্রামের স্কুল থেকে যে ছাত্র বের হয় তারা অধিকাংশ সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে না। আবার যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে তারা গ্রামের দিকে যায় না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামকে খুব একটা সেবা করেছে তা বলা যায় না। অথচ আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সেই বিশেষ অঞ্চলকে সেবা করা, যে সেবা হবে গ্রামীণ উন্নতির বিকাশের সহায়ক। হয়তো আঞ্চলিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয় না, তবুও নদীর অববাহিকার মতো যে পটভূমি, যে অঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি, যোগায়, সেই অঞ্চলকে উপেক্ষা করতে পারা যায় না।

মূলত বিশ্ববিদ্যালয়কে বিচার করতে হলে সামগ্রিক বিচার করা দরকার। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে যেমন শিক্ষক-ছাত্র দরকার, তেমনি দরকার অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। এই ত্রিবেনী সংগমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মিক স্ফূর্তি।

(৩)

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কোনটি হয়তো আঞ্চলিক, কোথাও শুধু চারুকলা শিক্ষা দেওয়া হয়, কোথাও শুধু মানবিক শিক্ষা, কোথাও বা শুধু বিজ্ঞান। কোথাও শিক্ষা দেওয়াই মূল শর্ত, কোথাও বা গবেষণা। বহু ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তার সংগে না আছে সমাজের যোগাযোগ, না হয়েছে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে পরিষ্কার কোন পরিকল্পনা। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে, বিভিন্ন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে। তাদের নিজেদের মধ্যে সংযোগ নেই, সংলাপও নেই। এর মানে এই নয়, বিশেষ সামাজিক চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলা উচিত। এর মানে এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোন সমাজ বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান নয়। সমাজকে স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়কে আজকে দশের ও দেশের দায়িত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতন হতে হবে। সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নয়, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ও সমাজের নিয়ন্ত্রণ করবে না। বিশ্ববিদ্যালয় হলো অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সমাজের যোগসেতু।

সমাজের চাপকে অনেক সময়েই ধরা হয় সরকারী চাপ। পৃথিবীতে দেখা যায় যেখানে সরকারী বিধি নিষেধ কম, সেইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য নিয়ত সঠিক লক্ষ্য পথে যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁধা গতের কাঠামোর মধ্যেই রাখতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের মোটা অংশ যেহেতু রাষ্ট্র দেয়, সেইহেতু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কী করা উচিত বা না করা উচিত তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্র ও সরকারের আছে। সরকারী নির্দেশের তারতম্য হয়তো থাকে এবং আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক স্বার্থকেই সেবা করে; বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্র হয়ে ওঠে না। তাছাড়া সরকারী নির্দেশনা বাড়তে দেওয়ায় বিপদ আছে। সেই বিপদ আসে ছাত্রদের কাছ থেকে। ছাত্ররাই প্রচলিত আইনের যথার্থতা নিয়ে চিরকাল সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ফলে সরকারীপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনও তীব্র।

ছাত্র অসন্তোষের নানা কারণ আছে। সক্রেটিসের আমল থেকেই ছাত্ররা প্রচলিত আইনকে মানে না। গ্রীক যুগেও ছাত্ররা সরকারী আমলা শিক্ষকের হাতিয়ার! আর আজকাল সরকার নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এখানে পিছিয়ে নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দলের হাতে ছাত্ররা আজ পুতুল। হয়তো কিছু নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের তাতে লাভ হয়, হয়তো রাজনৈতিক দলও কিছু সুযোগ সুবিধা পায়, এর ফলে ক্ষতি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই ছাত্ররা চাপ দিয়ে কর্তৃপক্ষকে এমন সব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে তাতে বিদ্যার উৎকর্ষতা বাড়ে না। ছাত্র আন্দোলনের রকমফের আছে। কানাডা থেকে ইউরোপ, এশিয়া থেকে আফ্রিকায় সর্বত্রই নানা-প্রকৃতির ছাত্র আন্দোলন। কারণ হয়তো ভিন্ন, কিন্তু ফল সর্বত্রই এক—তা হলো রাজনীতির বেনোজল বিদ্যায়তনে ঢুকে বিদ্যার আরাধনায় বিঘ্ন ঘটায়।

ছাত্র আন্দোলনের জন্য ছাত্ররা সর্বদা দায়ী নয়। প্রত্যেক আন্দোলনের পেছনে আছে কিছু শিক্ষক—যারা নিজেদের লাভের জন্য ছাত্রদের রাজনৈতিক খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আলোড়ন তোলা কঠিন নয়। কারণ কোন যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিক স্থূল বন্ধনে ক্যাম্পাস বদ্ধ নয়। এই পরিবেশকে যা আটসাঁট করে বেঁধে রাখে তা হলো মানুষের সদচিন্তা, সহনশীলতা, যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, যুক্তি নির্ভরতা। যুক্তিকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হলো বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা। অথচ বিজ্ঞানকে এড়িয়ে জ্ঞানের পথে কি যাওয়া যায়? যেমন শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিক্ষকের কথা ভাবা যায় না। শিক্ষকদের একাংশ শিক্ষা দেওয়া থেকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করাকে আরও জরুরী মনে করে। এই রাজনীতি কখনও কখনও এমন পর্যায় যায় যে, ধর্ম-জাতি-গোষ্ঠীর স্বার্থকেই এরা প্রাধান্য দিয়ে ফেলে। শিক্ষকদের একাংশ কর্তব্যচ্যুত। শিক্ষা বিতরণ করা বা ভাল শিক্ষক হওয়া এদের মূল উদ্দেশ্য নয়। নিশ্চয় এর অন্য অনেক কারণ আছে। কিছু শিক্ষক মনে করেন শিক্ষা না দিয়ে "গবেষণা" করে কিছু প্রবন্ধ ছাপালেই শিক্ষকতার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শিক্ষা দেওয়া ও গবেষণা করা পরস্পর বিরোধী নয়। কিন্তু এও সত্য, গবেষণার জন্য অনেক সময় শিক্ষকরা নিজেদের ছাত্রদের প্রতি অবিচার করেন। হয়তো ভারত সরকার বা মঞ্জুরী কমিশন এর জন্য দায়ী। ভাল শিক্ষকতার মানদণ্ড আজও তৈরি হয় নি অথচ 'গবেষণা' কতটা হয়েছে তার মোটামুটি মানদণ্ড আছে। এই "আকারগত" মানদণ্ডের উপর শিক্ষকের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে, শিক্ষাদানের উপর নয়।

শিক্ষক ছাড়াও আছে বহু সংখ্যক অশিক্ষক কর্মচারী। এই কর্মচারীরা মনে করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সামিল হয়ে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আদায় করাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে এদের বেতন দেওয়ার পর ঠিক হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী বা লেবরেটরির জন্য কী প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী আন্দোলনে এটাই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ বা গবেষণার দরকার অবশ্যই আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কি শিক্ষকতাকে বিসর্জন দিয়ে? শিক্ষকরা যদি শিক্ষার বাহনই না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কতটুকু শিখবে? তা ছাড়া গবেষণা যা করা হয় তা কতটুকু প্রয়োজনীয়? দেশের উপকারের সাথে যোগ আছে এমন গবেষণা খুব কমই হচ্ছে। বস্তুত যা গবেষণা হয় তার সঙ্গে না আছে শিল্পের যোগ, না আছে সমাজের সংস্পর্শ। বিদেশের নকল করে যে গবেষণা—তার মূল্য আমাদের মতো দরিদ্র দেশে আদৌ কিছু আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। রিসার্চ বা গবেষণা একটা অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার এবং সামাজিক প্রয়োজনে এর ব্যবহার করা উচিত। হয়তো এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অতিরিক্ত বোঝা। তবুও এই বোঝা বইবার সামাজিক দায়িত্ব আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অবশ্য আজকের দিনে ভারতবর্ষে অনেক গবেষণা করার জন্য প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এরা কোন শিক্ষা দেয় না, শুধু গবেষণা করে। কিন্তু যেহেতু গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক অথবা বিজ্ঞানীরা সবাই প্রায় একই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে, সেহেতু এদের মানসিকতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিন্ন নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। এদের একমাত্র লক্ষ্য "হয় থিসিস ছাপাও, না হয় ধ্বংস হও"। এই ছাপানো গবেষণামূলক নিবন্ধগুলি সত্যই দেশের সামাজিক পরিবেশে প্রয়োজনীয় কি না, তা জানবার আগ্রহ কারুর নেই। এইখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে কোন বিশেষ তফাৎ নেই।

অনেক দেশে আবার গবেষণা কেন্দ্রগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে এক "পরিপূর্ণ সংস্থা" গড়বার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হচ্ছে। কারণ অনেক সময় দেখা যায়, তথাকথিত গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণার মান নিকৃষ্ট ধরনের। এই নিকৃষ্ট মানের ছোঁয়াচে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মানও নীচু হতে বাধ্য। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অসংখ্য সমস্যার চাপে জর্জরিত। এর উপর

গবেষণা কেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য সমস্যা থাকাতে প্রশ্ন উঠেছে বৃত্তিমুলক পরীক্ষা, যেমন ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে? ডাক্তারী পরীক্ষা ডাক্তার-শিক্ষকরা ভাল করে বোঝেন, তারাই এদের উপযুক্ত অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এদের ডিগ্রী দিয়েই খালাস। কিন্তু উপযুক্ত ডাক্তার হওয়া বা না হওয়া কি ডিগ্রীর উপর নির্ভর করে? ডিগ্রী বোধ হয় এই সব বৃত্তিমুলক শিক্ষায় সম্পূর্ণ বিসদৃশ। তবুও এই সব বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ডিগ্রীর জন্য এত আকুলি-বিকুলি! স্নাতক-স্নাতকোত্তর সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে ডিগ্রী পাবার জন্য কাড়াকাড়ি। হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়কে এই সব বৃত্তিমুলক সংস্থা থেকে মুক্ত করলে সমস্যা অনেক কমে। স্নাতকডিগ্রী যারা বোঝে তারাই দিক। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু স্নাতকোত্তর বিভাগে স্বল্প সংখ্যক কিছু ছাত্রের শিক্ষা দিক—যেটা হবে মুলত গবেষণামুলক। বৃত্তি-মূলক ডিগ্রী থেকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা যায় তাহলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমস্যা অনেক কমবে— বৃত্তির উৎকর্ষতাও বাড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার অন্যতম কারণ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি। যে সব ছাত্ররা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী বা শিক্ষার জন্য আসছে তারা অনেকেই শিক্ষাগতভাবে এর উপযুক্ত নয়। যেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি সেইখানে গুণগত অবনমন। উন্নত দেশের তুলনায় উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতে অনেক কম। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মুহ্যমান। উচ্চশিক্ষা ব্যয় বহুল। এই ব্যয় আরও বাড়বে, হয়তো ২৫।৩০ গুণ হবে ভবিষ্যতে। অতএব যদি ছাত্র সংখ্যা বাড়ে তবে সমস্যা আরও জটিল হতে বাধ্য, যার প্রধান ফলশ্রুতি হবে গুণগত অবক্ষয়। ছাত্রসংখ্যা ভবিষ্যতে যদি বেশি হয় তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসম্বন্ধে চিন্তাধারা ঠিক করার সময় এসেছে। ছাত্ররা অমনোযোগী। পরীক্ষার আগে কোনরকম তিন চার মাস পড়ে

পরীক্ষায় পাশ করে। টেক্সট বই পড়ার চলন আজ নেই। বাজারু নোট মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী নেওয়া যায়। ফলে বাজারু নোটের যে ফলাও ব্যবসা শুরু হয়েছে তাকে উঠিয়ে দিতে না পারলে শিক্ষার মান আরও নীচে নেমে যাবে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্যা বাড়বে---সেই সমস্যা যেমন ছাত্র আবাসন নিয়ে, লাইব্রেরীর বই সংখ্যা নিয়ে, তেমন আবার লেবরটারীর স্থান সংকুলান নিয়ে। এটি দেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব, যদি আগের থেকেই আমরা চিন্তা করতে পারি ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা কেমন হবে। আজকের দিনে এটি স্পষ্ট যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় সেই চিন্তাধারা বিশেষ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রবিন্দু একটি—সেটি শিক্ষককূল। এই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়ান, একটি অলঙ্কৃত আকার দেন। অথচ শিক্ষকদের কর্তব্য সম্বন্ধে যেমন শিক্ষকদের অবহেলা, তেমন অবহেলা সরকারের। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগত উৎকর্ষতার জন্য তেমন কোন চেষ্টা হয় নি—যা হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত।

বিরাট বাড়ী অনেক টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে না। বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়তে লাগে শিক্ষকদের তিলে তিলে দানের উপর, এই দান যত বাড়বে ততই ছাত্র ও সমাজ হবে তাঁদের কাছে ঋণী। শিক্ষকদের শিক্ষকতার উপর নির্ভর করে ছাত্রদের কৌতুহল, জিজ্ঞাসা এবং আগ্রহ। এই জিজ্ঞাসু সৃষ্টিকামী উদার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসত্বা। এই প্রাণের স্পন্দন আজ স্তিমিত। এই প্রাণস্পর্শের অনুভূতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য দরকার, যাতে অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময় আলোকে আমরা যেতে পারি।

শিক্ষকরাই এই প্রাণের স্পন্দনটিকে, স্ফুলিঙ্গটিকে, অনির্বাণ আলোক শিখায় রূপান্তর করতে পারেন। তাঁদের অসাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিভূমি নড়িয়ে দেয়—তাঁরা যদি এ কথা না বুঝতে পারেন, অনুভব

না করতে পারেন তবে গতিহীনতা ও অবক্ষয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও মানব-সমাজের মুক্তি নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা—তাঁর কর্মকর্তার রূপায়ণে থাকে শিক্ষক। তাঁদেরই হাতে ভবিষ্যৎ মানব-সমাজ গঠনের পথ তৈরী করার কাজের ভার। সে পথ সুগম নয়। তবুও চেষ্টা করে যেতে হবে—যেতে হবে ছাত্রদের স্বার্থে, ভবিষ্যৎ মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে।

(৪)

উচ্চশিক্ষার কয়েকটা সমস্যার কথা বলা হলো। সমাধানের কথা সামান্যই আলোচিত হয়েছে। বিষয়টি জটিল। সে ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য একাধিক চিন্তাভাবনা এসে পড়ে। কোনটি প্রযোজ্য, কোনটি নয়—নির্ভর করবে দেশকালের উপর। অন্য কথায় বলা চলে স্থায়ী সমাধান বলে কিছু নেই। গতিশীল শিক্ষার সমস্যা সমাধানের মধ্যেও গতিশীলতাকে মেনে নিতে হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বহু অনুপযুক্ত লোকের ভীড় না কমাতে পারলে শিক্ষার মান বাড়াবার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। ভীড় হচ্ছে শিক্ষালাভের আকর্ষণে নয়, চাকরীর লোভে। অতএব কলেজী শিক্ষার নীচের দিকে যথেষ্ট কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা থাকা চাই। প্রকৃত উচ্চ-শিক্ষায় যারা বলীয়ান—তাদের এগিয়ে আসা উচিত এই বিষয়ে কার্যকরী প্রকল্প রচনা করতে। এই সব কাজে গ্রাজুয়েট ডিগ্রীর প্রয়োজন নেই, কিন্তু দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে এমন প্রকল্পে নিযুক্ত লোকের বেতন ডিগ্রীধারীদের তুলনায় কম হওয়া উচিত নয়। এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিলে ডিগ্রীর প্রতি মোহ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জানা উচিত—পাঠক্রমের মাধ্যমে হলেই ভাল—দেশের কী কী সম্পদ আছে এবং তা কি ভাবে কাজে লাগান যায়। শিক্ষাকালে ছাত্ররা যাতে এই সম্পর্কে নানাবিধ সমস্যার

কথা জানতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং তাদের ভাবতে দিতে হবে কী কী সমাধান সম্ভব। এমনি করে দেশের কথা তারা জানতে পারলে এবং কিছু করার প্রেরণা পেলে হয়তো বাইরের আকর্ষণ কমবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। আমাদের বেশীর ভাগ লোক থাকে গ্রামদেশে এবং দেশের সম্পদের অর্ধেক আয় আসে গ্রাম থেকে কৃষিকর্মের দৌলতে। সেই গ্রামকে, সেই দৌলতকে বাঁচান প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য—বিশেষ করে শিক্ষিতদের। যেমন দেশরক্ষার ব্যাপারে আবশ্যিক সামরিক শিক্ষা অন্যত্র চালু আছে, আমাদের উচ্চশিক্ষার বিদ্যায়তনে যারা প্রবেশ লাভের সুযোগ পেয়েছে—তাদের অবশ্য কর্তব্য গ্রামদেশের কথা ভাবা, তাকে সমৃদ্ধ করা, তাকে সেবা করা। অতএব পাঠক্রমও তদনুসারে পরিবর্তন করা দরকার।

উচ্চশিক্ষায় উচ্চাশা থাকা স্বাভাবিক—যা হলো বিশ্বের দরবারে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার। যারা এই কর্মে উপযুক্ত তারা যাতে সম্পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয় তার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। যারা এমনি করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে, খ্যাতি অর্জন করবে, তারা দেশের অমূল্য সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হওয়া উচিত যাতে এই ধরনের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে পারে।

দেশের শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য যে রাজনীতির খেলা চলে তার প্রতিফলন যদি বিদ্যায়তনের বাতাস কলুষিত করে তবে শিক্ষাগত উৎকর্ষতার কথা না ভাবাই ভাল। রাজনীতির লোকেরা সাময়িক ক্ষমতার যুদ্ধে নিযুক্ত—তার কোনোরকম স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু শিক্ষা লাভ যে কোনো সাময়িক লাভের উর্ধ্বে। অতএব রাজনীতির কলাকৌশল শিক্ষায়তনে অচল। কিন্তু ছাত্রদের ভুলপথে পরিচালনায় রাজনীতিবিদরা বদ্ধ পরিকর। তাদের সাময়িক লাভ যে স্থায়ী ক্ষতির কারণ তা বুঝেও বুঝতে চান না। রাজনীতিতে ছাত্রদের যোগদান অবাঞ্ছনীয় এবং সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। পঠন-পাঠনের মধ্যে ছাত্ররা

বিতর্কে যোগ দিক, কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণ পাঠ্যাবস্থায় নিষ্প্রয়োজন। রাজনীতির বেনোজলে যে সব নোংরা প্রবেশ করে—বিদ্যায়তনের সুস্থ পরিবেশ তাতে রক্ষা করা যায় না। দেশের স্বার্থ যদি দলীয় স্বার্থের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে বিদ্যায়তনে রাজনীতির প্রবেশ রুদ্ধ করতেই হবে। বিদ্যায়তনকে যদি রাজনীতির ওঠানামার সঙ্গে তাল সামলে চলতে হয় তা হলে শিক্ষাদান ভড়ং-এ পরিণত হবে। আমাদের দেশে এই ভয় আরও বেশী—কারণ এ দেশে রাজনীতি যারা করে শিক্ষার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। ছাত্রদের রাজনীতি করতে উৎসাহ দিলে যে সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তা বুঝবার ক্ষমতা তাদের আদৌ নেই। এই একটিমাত্র পদক্ষেপে সমগ্র পরিবেশ সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হবে এবং বিদ্যায়তনগুলি সত্যিকার জ্ঞানান্বেষণের পীঠস্থান হয়ে উঠবে। শেষোক্ত কাজের উপযুক্ত লোক মুষ্টিমেয় হলেও এখনও বিদ্যায়তনগুলিতে রয়েছে তাদের সুযোগ দিলে তারা নীরবতা ভঙ্গ করে সাহস করে এগিয়ে আসবে—এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

(৫)

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রবার্ট হাচিনসের একটি উক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন "অন্বেষণার নির্বাধ অনুমতি, আলোচনার স্বাধীনতা ও শিক্ষার মুক্তি—এদের ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়াতে পারে না। সত্যের অন্বেষণ ও আলোচনাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব। যদি তা না ঘটে—তবে তা বিশ্ববিদ্যালয় নয়।"

এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি প্রকৃতিতে দেখি, যখন দেখি একই পরিবেশ, একই সূর্যালোকে, একই জাতের বীজে যে গাছ পাওয়া যায়, তাদের অনেকে ক্ষুদ্রকায়, অনেকে মাথা উঁচু করে পত্রবহুল হয়ে দাঁড়ায়। যে গাছ সহজে বড় হয়, যার ছত্রচ্ছায়ায় বহু পাখি বাসা বাঁধে, সেই গাছের উপর দাঁড়ালে দৃষ্টি অনেক দূরে যায়। এই বৃদ্ধি

স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। সমান যত্নে, সমান পরিবেশেও বৃদ্ধির পুষ্টির তারতম্য ঘটে। যে গাছ সহজে বড় হতে পারে, মালীর নিরপেক্ষতা সেখানে নষ্ট হয়। হয়তো সামান্য অতিরিক্ত যত্নে এই সাবলীলতা পরিস্ফুট হয়। মালী তা জানে।

বিশ্ববিদ্যালয়কেও তা জানতে হবে। দ্রোণের কাছে অর্জুনের যে অতিরিক্ত অস্ত্রসাধনা তা দ্রোণার্জুনের মিলিত প্রয়াসে সৃষ্টি। সব শিষ্যের প্রতি আচার্য সমদৃষ্টি দিলেও, কোন শিষ্য তার নিজের আত্মিক শক্তিতে এগিয়ে যেতে পারে। তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষকের সম্মান, ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা, এ জানাতে ফাঁকি থাকতে পারে না।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বড়ই রহস্যময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে উঠেও মানুষ নিজেকে কী করে যে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে কিছুতেই বোঝা যায় না। সেই অবনমন ও অবক্ষয়ের পঙ্ক থেকে আবার এক সক্রেটিস জন্মায় জীবনাহুতি দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে। মানুষই আনে তার অবক্ষয়, ঘটায় মূল্যবোধের অবসান। সেই আবার প্রতিষ্ঠা করে মানুষের মহত্ত্ব ও গরিমা। ওঠানামার জগতে এই ধরনের মানুষই চিরন্তন সম্পদ ; প্রকৃত বিদ্যায়তনেই তাদের জন্ম। বিবর্তনের বীজটি বেঁচে যাচ্ছে কেমন করে, কিসের প্রেরণায়, সে রহস্য এখনও অনাবৃত হয় নি। তাকে নিরন্তর খোঁজার পথটিই মানুষকে উচ্চ থেকে উচ্চতর জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে যায়। অগ্রগতির সেই প্রবহমান ধারায় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ সেই নিরন্তর বহতা ধারাই উচ্চশিক্ষা। সেখানে নৌকাটি বাইতে হয়, হালকে পরিচালিত করতে হয়। এই ক্রিয়া, এই গতি—একে বাদ দিয়ে কোন নির্দিষ্ট কাঠামোতে মানুষের অগ্রগতিকে বোঝা সম্ভব নয়। এটি দেশকালের ধারণার পরিপন্থী।

দেশকালের অন্তর্ক্রিয়ার জগতে, মানুষের অগ্রগতির পথে অন্তর্ক্রিয়া কাজ করে। নানা বিকল্প থেকে সঠিক পথটিকে চিনে নেওয়া হলো বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে এড়িয়ে উচ্চশিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হয় না।

সমন্বয়-বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ

এ যুগে ফিজিক্যাল সায়েন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সর্বতোমুখী বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দ্বিধা থাকে না। স্পিরিচুয়াল সায়েন্স বা আত্মিক বিজ্ঞান আজকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সার্বভৌম শাসনে একপাশে যেন সরে থাকে। আত্মিক বিজ্ঞানের সভ্যতাকে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্সের সাপেক্ষেই বিচার করি। অথচ এই বিজ্ঞানের নিরঙ্কুশত্ব বহুবার ভেঙে গেছে, তবু আত্মিক বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিরিখেই পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ যে কেন—তা সব সময় বোঝা যায় না। এই দুই বিজ্ঞান হয়তো একটি সমতটে দাঁড়ায়। ...এই ভাবনার প্রমাণে আজকের মানুষ পথ হাতড়ে এগুতে চায়; অন্বেষণের সেই ইতিবৃত্তও জানার!...

মানুষের বহির্জগতের ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে; পরীক্ষায় প্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে এই বিজ্ঞান। অন্যদিকে মানুষের অন্তর্জগৎ, তার অন্তর্নিহিত ধ্যানধারণার উপর আত্মিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; তার ভিত্তিতে থাকে অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান। আত্মিক বিজ্ঞানকে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম দিয়ে বোঝানো যেত, অথবা ধরা যেত আত্মিক বিজ্ঞানের ছকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে—তবে হয়তো সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হত। সেই প্রমাণ কিন্তু নেই; দুটি যেন দুই জগতের অধিবাসী; যেখানে মিল নেই, মিল খোঁজাও দুষ্কর।

এই শতকের প্রথমেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শুরু; আর তারপর কালক্রমে, শতাব্দীর মধ্যভাগে, কতকগুলো সংশয়-দ্বিধা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিচলিত হয়ে ওঠেন। দর্শক আর দৃশ্যের সম্পর্ক-সম্বন্ধের আপেক্ষিক

ধারণার উপর বাস্তব জ্ঞান গড়ে ওঠে। জড়বস্তু বা ম্যাটারকে এই বিজ্ঞান বাস্তব বলে মেনে নেয়। আধ্যাত্মিকতা ছিল বিজ্ঞানের পরিসরের সম্পূর্ণ বাইরে। তবু যা দেখা যায়, তা যেন জানায় ম্যাটারই একমাত্র পরম নয়, শেষ কথা নয়।

হিন্দুধর্মের অভিজ্ঞায় আত্মা ও জড়বস্তুর বিভেদ টানা হয় নি ; এরা পরিপূরক। তেজ অথবা মনন থেকে জড়বস্তুর উদ্ভব ; আবার ব্রহ্মের সান্নিধ্যে এ দুটির প্রভেদ লোপ পায়। আত্মিক ভূয়োদর্শনের স্পর্শে একটি মানুষের কাছে জড়ের অস্তিত্ববোধ হারিয়ে যায়, হিরণ্য-জ্যোতিতে লীন হয়।...আত্মিক অভিজ্ঞতার শীর্ষবিন্দুতে থাকে সমাধি—যেখানে মানুষের অভিন্নতা বোধের পরিসমাপ্তি ;—আত্মা, যা একমাত্র বাস্তব সত্য, সেখানে সে মিশে যায়।...প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে এটম থেকে জড়বস্তুর সৃষ্টি, তা ইন্দ্রিয়াতীত ; পরীক্ষার পথে এই ইন্দ্রিয়াতীত ধারণাটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় পরিবর্তিত করে একে উপলব্ধি করা হয়। কতদিন গেছে, কত নতুন পথে এটমের স্ট্রাকচারটি পরিপূর্ণভাবে বোঝার চেষ্টা হয়েছে ; তবু যেন মনে হয়েছে সমস্যার তল নেই ; এটমের রহস্যের সীমা নেই। পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতি ঘটেছে ; শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর, সূক্ষ্মথেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ; তবু ধরা পড়েনি এটমের দুর্বোধ্য জটিলতা।...অথচ এই এটম হলো জড়বস্তুর মৌলিক মালমশলা, তার বিল্ডিং ব্লক! ....বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি মানুষের বর্তমান আকাঙ্ক্ষা চাহিদা যেমন মেটাতে পারে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নতুন আকাঙ্ক্ষা নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে। নিত্য পরিবর্তনশীল বহির্জগতের দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষ চলতে পারে না ; ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

লিঙ্কন বার্নেট তাঁর 'ইউনিভার্স এণ্ড ডক্টর আইনস্টাইন' গ্রন্থে এই ভাবনার বিস্তৃতিতে বললেন, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বুদ্ধিসঞ্জাত ধ্যান ধারণায় শেষমেশ এমন ফাঁক থেকে যায় যা মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা দিয়ে ভরাট করা অসম্ভব। তার সীমার মধ্যে মানুষ বদ্ধ থাকে—থাকে

প্রকৃতিতে বিজড়িত হয়ে। নিজেকে সে জানতে অক্ষম বলে, যে বিশ্ব জগতে সে আছে তাও তার কাছে অবোধ্য হয়ে থাকে। রোমাঞ্চময় অথচ সরল তার নিজস্ব যে অনুষঙ্গটি—তাও সে জানে না। আর জানে না বলে সে নিজেকে অতিক্রম করে যেতে পারে না ; উপলব্ধির ক্রিয়ায় নিজেকে সে চিনতেও পারে না !'

টেইলহার্ড গু শার্দ তাঁর 'ফেনোমেনান অফ ম্যান' গ্রন্থে লিখলেন, "বিশ্ব জগতের যে কোনো ব্যাখ্যা, এমন কি দৃষ্টিবাদীর ব্যাখ্যাও বস্তুর অন্তঃ আর বহিঃ কে যদি একযোগে প্রকাশ করতে না পারে তবে সে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। মনন বা আত্মা ও জড়বাদ—দুটিই বিবেচনার। তার সমগ্রতা নিয়ে মানুষ যেদিন বিশ্বলোকের সুসঙ্গ সুষমায় স্থান পাবে, সেদিনই পাওয়া যাবে সার্থক ফিজিক্স—ফিজিক্সের সঠিক অস্তিত্ব সেখানেই।"...

(২)

অধ্যাত্মবাদে বলা হয়—জীবনের একমাত্র কাম্য হলো ঈশ্বরকে জানা : অতএব জ্ঞান ও ভক্তিযোগ অনুসরণ কর, আর মানুষের মধ্যের ঈশ্বরকে সেবা কর। অধ্যাত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদের মতে জীবনের একমাত্র ফলিত সত্য হলো ধর্ম। একে মানা বা না-মানা মানুষের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। যদি কেউ আত্মিক শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করে, তবে ফল আসবেই। এককথায় সংক্ষেপে বলা যলা যায়, 'ঈশ্বরের পথে এক পাও যদি এগুনো যায়, তবে ঈশ্বর শতপদ অতিক্রম করে নিকটে ধরা দেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি ইন্দ্রিয়গোচর বিস্ময় বলে ইশারউড জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার নিদর্শনটি সাধ্যমত বর্ণনা করেছেন তিনি। তবু জীবনীর শেষ অংশে তিনি প্রশ্ন রাখেন—সেই নিদর্শনের ব্যাখ্যা কোথায় ? কোথায় তাদের রসক্রিয়া ? দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার পথে ধরা যায় না বলে অসঙ্গত-অপ্রাসঙ্গিক বলে মন থেকে এদের কি সরিয়ে

রাখা হবে? অথবা জীবন ও অভিপ্রায়ের পরিবর্তনের ধারার যাত্রারম্ভের চিহ্ন বলে এদের মানা হবে?…এ জাতীয় প্রশ্নের হুল যন্ত্রণা শ্রীরামকৃষ্ণকেও সইতে হয়েছিল। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানীর মত তাঁর উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তগুলিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন ; কারণ তাঁর উপলব্ধির অনুরূপ কোনো কিছুকে প্রমাণের পথে তিনি পান নি। ঈশ্বরকে পাবার জন্য সব কিছু ত্যাগ করা দরকার—এ ছিল তাঁর প্রতীতি, তাঁর উপলব্ধি। তবে তা কোন্ পথে, কেমন করে হবে?…

আত্মিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তি স্বরূপহীন কোনো উৎস, —যেমন বই স্মৃতি বা শ্রুতির পথে—এই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষজ অনুভূতির ফলে যদি এই অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে, তবে এই অনুভূতি যার আছে সেই এর সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম। এই জগতে আত্মিক অভিজ্ঞতা সর্বজনীন নয়। যাঁরা সমানুভূতিক তাঁরাই এই অভিজ্ঞতার অংশী হতে পারেন। অথবা এই ভূয়োদর্শীর সততা সম্বন্ধে যদি আমরা দ্বিধা সংশয়মুক্ত হই, তাঁকে সর্বাত্মকভাবে মেনে নিতে পারি, তবে এই অভিজ্ঞতার মূল্য বুঝি প্রতিষ্ঠা পায়! এই জাতীয় সামান্যতম অভিজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে অশেষ আস্থা।…অন্যদিকে যদি বহিঃরঙ্গীন প্রক্রিয়া, মাদক বা উদ্দীপক গ্রহণের ফলে মানসিক অবসাদ অথবা ক্লৈবত্বের পথে এই অভিজ্ঞতা কখনো ঘটে, তবে এর ফলাফল তাৎক্ষণিক। এটি যদি সৎ হয়, তবে সেই উপলব্ধি যত তুচ্ছ বা সামান্য হোক, তার প্রভাব সারাজীবনে থেকে যায়। বহিঃরঙ্গীন প্রক্রিয়ালব্ধ আর আত্মিক ক্রিয়া সঞ্জাত উপলব্ধির পার্থক্যটি বিশাল।

তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের আত্মিক ও অভিজ্ঞতার পরিসরটি পরিমাপ করে তিনি তাঁদের জীবনটিকে পরিশীলিত করেছিলেন। তাঁর আত্মিক শক্তির প্রভাব যে পৃথিবীর প্রত্যন্ততম অংশেও ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে বিস্ময়ের স্থান নেই।…তবুও ব্যক্তিগত আত্মিক অভিজ্ঞতাকে জানানো যায়, প্রকাশ করা যায়; কিন্তু তার অংশী করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "অল্প কজনই অভিজ্ঞতা প্রসূত

শিক্ষাব্রতী হতে পারেন, এঁরা মিস্টিক, মরমী ! সব ধর্মের এই মরমীয়ারা একই ভাষায় একই সত্যকে জানিয়ে গেছেন ; এটিই ধর্মের বিজ্ঞান রূপ !" অধিবিদ্যার জগতে এই মরমীয়া অভিজ্ঞতার পথে যে সত্যকে জেনেছেন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত তারা প্রমাণসিদ্ধ ; এদের প্রমাণ করা যায় !

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার অভিজ্ঞা অনন্য ও অসাধারণ এবং কিছু বা রহস্যে ঘেরা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যে এর তুলন পাওয়া যায় না।

বিশ বছরের বয়সে এই অনিত্য অসার জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে পরমা মাতা কালীর দর্শনাভিলাষী হলেন। তাঁব সান্নিধ্য থেকে এক মুহূর্ত দূরে থাকতে চাইলেন না। যেখানে সেখানে যখন তখন তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন ; পার্থিব বিষয় বৈভব কে তুচ্ছ করলেন। সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত কুণ্ডলিনীর অধিরোহণের ফলে বুকে রক্তাভা দেখা দিল। আর্তস্বরে তিনি কাঁদলেন ; মাকে দেখা দিবার জন্য বারবার কাকুতি মিনতি করলেন।…তাঁর দেখা পাবার বিফলতায় হতাশ হয়ে মায়ের খড়্গে নিজের জীবন বিসর্জন করতে প্রয়াসী হলেন তিনি। আর তারপরের সেই অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যের আবির্ভাব তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়,—আত্মিক অভিজ্ঞতার সীমাহীন উৎস হয়ে সেই দৃশ্য তাঁর জীবন নিষিক্ত করে তোলে।

এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তিনি যে কথা বলতেন, তা যেন এই ঃ সব জড়বস্তু চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল। সীমাহীন অনন্ত অপার জ্যোতিঃসমুদ্র দেখা দিল,—সে বুঝি সজ্ঞান ! দ্রুত ছুটে আসা আলোর ঢেউ বারবার আছড়ে পড়ে, এক অজানা অতলে তাঁকে যেন তারা তলিয়ে নিয়ে গেল। আঁকপাঁকু হাঁসফাঁস করে তিনি ছটফট করতে লাগলেন ; তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কালীকে

সত্যিই তিনি দেখেছিলেন কিনা সে তর্ক থাকে; তবে নিজেকে ফিরে পেয়ে শুধুমাত্র তাঁর নামই তিনি উচ্চারণ করলেন।

এই অভিজ্ঞতার দ্বারে বহুবার তিনি পৌঁছেছিলেন। আর অগণিতবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে যেন জ্ঞান-অজ্ঞানের দোলায়, যেন ঘোরে, তিনি এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে গেছেন। তিনি বলতেন, তাঁর ভিতরে যেন শৃঙ্খল ঝঞ্চনা বেজে উঠতো, মনে হতো তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বেঁধে কেউ যেন তাঁকে নিষ্ক্রিয়-নিশ্চল করে তুলতো; জোনাকির মত আলোর কণিকা তাঁকে ঘিরে ভেসে বেড়াতো! রূপো-গলা উজ্জ্বল আলোকতরঙ্গের ঢল নামতো। তারা যে কি, তারা কে —তিনি তা বুঝতে পারতেন না; মাকে বলতেন, "এ কিসের ইঙ্গিত বুঝিয়ে দে, মা।" অবশেষে মায়ের শিশুটি হয়ে তিনি ঘুরতেন ফিরতেন; যখনই চাইতেন তখনই যেন মাকে দেখতেন,—দেখতেন মন্দিরে অথবা মন্দিরের বাইরে। মায়ের সঙ্গে তাঁর এই খেলার অনেক গাথা শোনা যায়, অনেক লেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতা যে একটি কঠিন সুসম্বদ্ধ পরীক্ষার ফল, তাতে দ্বিধা নেই। —এটি অবিশ্বাস্য কল্পনাও নয়! প্রতিপদে তাঁর নিজের দেখা নিয়ে সংশয় তুলেছিলেন। একজন সৎ পরিশ্রমী বিজ্ঞানীর মত বারবার পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেছেন; যে পথে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যায় বলে জানা যায়, সেই পথের খোঁজ জানলে ঐকান্তিক আগ্রহে, নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে এবং অবিচল বিশ্বাসে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতেন; সিদ্ধি লাভ না হলে থামা নেই, বিশ্রামও নেই।

কত সরল অথচ কত অসাধারণ তাঁর এই খোঁজার পথ! হনুমানের মত রামের দর্শন অভিলাষী হয়ে তিনি লাঙ্গুলধারী প্রাণীর মত নিজেকে ভাবলেন। শোনা যায়, সাধনার সেই সময়ে হনুমানের ল্যাজের মত একটি প্রত্যঙ্গ তাঁর শরীরে দেখা দেয়। নিরীক্ষার এই কালে সীতার দর্শন তিনি পান এবং সীতা তাঁর শরীরে বিলীন হয়ে যান।···চোখ-খোলা অবস্থায় এটিই তাঁর অতি প্রাকৃত দর্শন।··

ভৈরবী-তোতাপুরীর সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা, মুসলমান ও ক্রিশ্চান মতে সাধনা—অধ্যাত্ম জগতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সার্থক অনুসৃতির উদাহরণ! এই সব পদ্ধতি তিনি সহজ সরল ভঙ্গীতে করে গেছেন। পূর্বসূরীদের বর্ণনামত অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ না করে তিনি বিরত হন নি। এই সময়ে তিনি জানলেন, (১) জন্ম বা দীক্ষা ধর্মের অনুসাশন নয়। (২) একজন গুরু বা শিক্ষকের নানা মতের সাধনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। (৩) তাঁদের শিক্ষায় পরিব্যাপ্ত হবে বিশাল পরিসর একটি সর্বজনীন পটভূমি।···

(৪)

চন্দ্র বা গিরিজার মত যাঁরা সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের ধিক্কার দিয়েছেন;—তাঁদের কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। পথের শেষে উপনীত হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই বহুবার তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা যে কী জানায়, তা নিয়ে নিজেকে বা অন্যের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন। পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিতে নিজের জানা সত্যকে মিলিয়ে দেখেছেন। যাঁদের তিনি জ্ঞানী অথবা সন্ধানী বলে জানতেন, তাঁদের কাছে তাঁর এই অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা চেয়েছেন, অনুজ্ঞা খুঁজেছেন। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান জগতে যাঁরা তত্ত্বান্বেষী, তাঁদের পথ থেকে তাঁর অনুসন্ধিৎসা তো ভিন্ন নয়! একজন সৎ ও প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর মত যা তিনি জেনেছেন বা যা তিনি করতে সক্ষম তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন নি, সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগও দেখান নি!

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও নতুন তত্ত্বকে প্রমাণিত করতে হয়। সেই তত্ত্বের প্রমাণ কেউ যদি সঠিকভাবে দিয়ে থাকে, তবে নিজের হাতে সেই প্রামাণ্য কাজটি না করেও অন্যেরা তা মেনে নেয়। আত্মিক অভিজ্ঞতার জগতে একই রীতির ব্যঞ্জনা। একই ধরনের সাধনায় মগ্ন ভিন্ন ভিন্ন সাধকদের অনুপুঙ্খ কাজের ধারায় যে ফল লাভ করা

যায়—সেখানে দেখা দেয় এক আশ্চর্য মিল! এই মিল আকস্মিকতায় ঘেরা নয়। …আত্মিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা এমন ভাবে সন্নিবেশিত হয়ে আছে যে, বিজ্ঞানের পরীক্ষার পদ্ধতির মত এখানেও প্রতিটি ধাপ বা ক্রমের ক্রিয়া ব্যক্ত করা যায়; প্রতিটি ক্রমে কী অভিজ্ঞতা হতে পারে, তার প্রাগুক্তিও করা যায়। প্রাকৃতিক বা আত্মিক বিজ্ঞান, যাই হোক না কেন, অপরিহার্য হলো অনুশীলনের অগ্রগতি।…ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বর সম্পর্কীয় উক্তি আছে; তবু বলা যায় সেখানে স্বয়ং ঈশ্বরকে ব্যক্ত করা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের সম্পর্ক-সংবাদ জানাতেই নিবৃত্ত হলেন না; প্রশ্ন করলেন কোন পদ্ধতিতে শুধু ঈশ্বরকে জানা যাবে। এই প্রশ্ন, এই অন্বেষণের মৌলিক পদ্ধতি উপনিষদে জানানো হয়েছে; —বলা হয়েছে পরাবিদ্যা বা নির্বিশেষ জ্ঞানের ধারায় ঈশ্বর উপলব্ধি ঘটে; ধীরে ধীরে সত্যের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে চলে মানুষের যাত্রা!…

প্রসঙ্গত স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে, জগতের সব ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র বেদ ঘোষণা করেছে যে, উপনিষদসহ সমগ্র বেদ পঠন প্রাসঙ্গিক নয়। সেই অব্যয়কে উপলব্ধি করাই একমাত্র মৌলিক ধর্ম। পঠন, মনন বা নিদিধ্যাসনে এই উপলব্ধি হয় না। এই উপলব্ধির স্পর্শ পাওয়া যায় একমাত্র অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা সমাধির পথে।…

হয়তো, তাই, পিপাসু জিজ্ঞাসু শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানের বিবিধ শাখায় মানুষের বিচরণটিকে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলেন: জানতে চাইতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অথবা দর্শনের তত্ত্ব! যা তিনি জানেন না, যা তাঁর কাছে নতুন,—তাই তাঁর কৌতূহলের। তাদের জানতে চাওয়াই তাঁর আকাঙ্ক্ষা!… অথচ, অনেকবার তিনি বলেছেন, জ্ঞানের শীর্ষবিন্দু ঈশ্বরকে জানলে আর জানার কিছু থাকে না। তবু ঈশ্বরকে জেনেও, এই বিনয়ী অভিমানশূন্য মানুষটি বিজ্ঞান ও দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে গেছেন!

আত্মিক বিজ্ঞানের শীর্ষবিন্দুকে যিনি জেনেছেন, তাঁর কাছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সত্যোপলব্ধি অসম্ভব নয়। অথচ সাধারণ মানুষের

মত তাঁর এই জানা, এই জ্ঞানের সাহায্যে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য চরিতার্থ করতে তিনি চান নি। তাঁর জিজ্ঞাসা, তাঁর বিস্ময় অথবা কৌতূহল প্রকৃতিকে ছাপিয়ে যেন বিস্তৃত হয়েছে। অনন্তের সান্নিধ্যের স্পর্শ পাবার পর তাঁর নিজের তৃপ্তির জন্য চাইবার আর কিছু ছিল না। পার্থিব সুখবোধে বিগতস্পৃহ, অনীহ—তিনি ছিলেন তাই।

(৫)

আত্মিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা থেকে একটি সামীপ্য বোধের ধারণা জাগে। তবু দুটির মধ্যে ব্যবধানটি দুস্তর, হয়তো বা অনতিক্রম্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে অভিগমন ধরা পড়ে, যে সহযোগিতার স্পর্শ পাওয়া যায়, হয়তো আত্মিক ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি এর কারণ। তবু মানব জাতির উন্নতির জন্য দুটিকেই দরকার; দুটিকে এক করাও প্রয়োজন। একদা স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "ক্ষুদ্রতমের বিধৃতিতে ধরা যাবে বিশালতমকে, বিশালত্বের আঙিনায় দেখা দিবে ক্ষুদ্রত্ব! প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুরূপ খোঁজা হবে আত্মিক জগতে, আর আত্মিক বিজ্ঞানের সম্পূরকত্ব ধরা পড়বে বহির্জগতে।"... প্রাকৃতিক ও আত্মিক বিজ্ঞান—দুটিই সত্যকে খোঁজে; দুটিই মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতির দিশারী। এদের আলাদা করে দেখলে দেখা যায় এরা অসম্পূর্ণ এবং অপ্রতুল; অথচ একযোগে এরা পরিপূর্ণ। বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রবন্ধে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জানালেন, "ভারতীয় চিন্তা জানায়, দুটি পথ আছে। বিচার করে দেখলে হয়তো দীর্ঘকালে, অবশেষে, দুটি পথ পরিপূরকত্ব রূপ পেতে পারে। অন্যদিকে দুটির সমন্বয়ের পথে মানব-প্রতিভার সার্থক সংসাধনের সর্বতোমুখী অভিব্যক্তিটি ধরা যায়।"

রবীন্দ্রনাথের কথায়, "কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি, তাহা জগৎ পরিচয়ের কেবল সামান্য অংশমাত্র। সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের

চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে, গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি।”

অন্য প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ জানালেন, “প্রতিটি আত্মায় দৈবী-শক্তি সুপ্ত হয়ে আছে। বহিঃ ও অন্তঃ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ঐশী শক্তির বিকাশেই একমাত্র উত্তরণ সম্ভব ”

উপলব্ধির পথের শেষে পৌঁছানোর যে পদ্ধতি উপনিষদে আখ্যাত হয়েছে, তার প্রমাণ বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত বহু সাধকের নিরীক্ষায় জানা গেছে। সব পদ্ধতিতে একটি সুনির্দিষ্ট মিল, একটি নির্দেশনা আছে।...প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যা দেখা যায় তার কার্যকারণ সম্মত বাস্তবাভিমুখী প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। দেশ ও কালে ঘটে চলে তার প্রতিপাদন ক্রিয়া!...একই রীতি প্রকাশ পায় আত্মিক বিজ্ঞানে। মানুষের মধ্যে আত্মা বা ঈশ্বরের অংশকে দেখেন ঋষি। অন্যেরা এই দেখায় সংশয় তোলেন। তবু বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায় এই দেখা সত্য। দেশকালের বিধৃতিতে মানুষ-মানুষের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে পরিশেষে ব্যষ্টি অভিজ্ঞতার সঞ্চার ধরা দেয়। এই পরীক্ষা যে কেউ করতে পারে! এই অভিজ্ঞতার পর পরীক্ষক বলে ওঠেন, বেদাহমেতম্—আমি এঁকে জেনেছি! ..এই কাজ সকলেই তো পারে! এটি বিশ্বাস নয়, এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা!....

বহু যুগের বহু সাধকের ধারায় উপনীত সিদ্ধান্তের সত্যতার প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ খুঁজেছিলেন। শুধু তাই নয়,—সব সাধনার সব সিদ্ধান্ত যে একটি সর্বজনীন সর্বকালীন, সার্বভৌমিক উপলব্ধিতে মিলে যায়, তাও তিনি জেনেছিলেন, জানিয়েছিলেন। আত্মিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের ধারণা শুধু নতুন নয়, এ অনন্য, এ তুলনারহিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও তাঁর আত্মিক অভিজ্ঞতা নিখিল বিশ্বের মর্মস্পর্শী আনন্দ স্বরূপ হয়ে যে দেখা দিবে তাতে সন্দেহ কোথায়? তাই যে স্বাভাবিক!

বিজ্ঞান ও মানবিকতা

একথা আজ সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই উন্নয়ন সম্ভব। অথচ এই উন্নয়নকে কার্যকরী করতে গিয়ে মানুষের সামগ্রিক উন্নতির বিকাশে কতগুলি সমস্যা হাজির হচ্ছে।

প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নকে দেখা যায়। এক ধরনের উন্নয়ন বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কার্যকরী হয়। অন্যটি জীবজগতের অজ্ঞাতসারে চলতে থাকে,—কিন্তু পরীক্ষা ও প্রমাণের সাহায্যে ঐসব উন্নয়ন কর্মেরও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করা যায়; বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োগে নতুন নতুন উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা ভাবা যায়; আর অজানা অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কার্যকারিতা এইজন্যেই স্বীকৃত!

সামগ্রিক উন্নতি বলতে বুঝতে হবে অর্থনীতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জৈবিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি। সব উপাদান যদি একযোগে কাজ করে তাহলেই উন্নয়ন তাল রেখে অব্যাহত চলতে পারে, সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে; নইলে সমস্যা থেকেই যাবে।

বিজ্ঞানের দুটি দিক। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে ততদিন—যতদিন না তার বিরুদ্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায়। প্রায়োগিক বিজ্ঞান মানুষের চাহিদা মেটায়। চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রায়োগিক বিজ্ঞানের দৃঢ় মেলবন্ধন রয়েছে। যে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে প্রায়োগিক বিজ্ঞান প্রসারিত হলো, সে ভুল প্রমাণিত হলেও প্রয়োগ কর্মের গতি প্রকৃতি তেমন বদলাতে নাও পারে। প্রায়োগিক বিজ্ঞানের অর্থনীতিক দিকটা এত বড় করে

দেখা হয় এবং এত বেশি মূল্য দেওয়া হয় যে এর বিপরীত প্রভাব কিংবা বৈষম্যের কথা তুলে কেউ আলোচনা করতেও চায় না। এই অবহেলার ফলে বিজ্ঞানের উপর অনেকের আস্থা কমে আসছে ; তার মধ্যে বিজ্ঞানীরাও আছেন।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ অথবা উপশম, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম, এমন কি শক্তি সংকট থেকে মুক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা যতটা আস্থা নিয়ে এগোতে পারে, ততটা পারছে না জন-সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ প্রকল্পে, জলবায়ু ও সমুদ্র দূষণ প্রতিরোধে, কিংবা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস করতে। অপাচ্য বস্তু সামগ্রীর পরিমাণ অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে। পূরণ করা যাচ্ছে না প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত চলা ঘাটতিকে। এই সংকট বিশ্ব-ব্যাপী। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নকামী সবাইকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সময় থাকতে রাস যদি টানা না যায়, তবে নিঃসন্দেহে এই সংকট ভবিষ্যতে আরো বিষম হয়ে দাঁড়াবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা আয়ত্ত করা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ : বেশ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় এবং বহু বছরের শ্রমসাধ্য সাধনা দরকার। যাদের সেই অর্থ নেই, অথচ দ্রুত উন্নতি চান, তারা উন্নতিশীল দেশগুলির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। উন্নতিশীল দেশগুলি উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসতেও রাজি। পরিবর্তে তারা যে সব শর্ত দেবে আপাত দৃষ্টিতে তা পালন করা কঠিন নয়। কাঁচামাল সস্তায় দিতে হবে এবং টিকির সঙ্গে মাথাটাও ; অর্থাৎ স্বনির্ভরতা বিসর্জন ! তাছাড়া উন্নয়নের ধারা তাদের মতই হবে। এইসব ক্ষেত্রে উন্নয়নকামী বা অনুন্নত দেশগুলির বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে প্রায়ই বিকল্প কোনো মতামত পাওয়া যায় না। কারণ তারা নিজেরা উন্নত দেশে শিক্ষা লাভ করেছে, তাছাড়া, তাদের জীবন ও আদর্শ হয়তো একই সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শাসকশ্রেণীকে এরা অন্য কী পরামর্শ দেবে !

প্রতি দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে একটি প্রশ্ন থেকে যায়—বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কে যোগাবে? কোনো সরকার কি এই হাতী পোষার খরচ বইতে পারতো যদি না অর্থ বিনিয়োগের প্রতিদান কয়েক গুণ হয়ে ভাণ্ডার পূর্ণ করতো? প্রায়োগিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আর্থিক উন্নতি সম্ভব; দারিদ্র্য ও রোগ প্রতিরোধের কাজে এর ব্যবহার সম্ভব; যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করে দেশরক্ষা ও ব্যবসায় দুইই চালানো যায়;—তাই বিজ্ঞানীদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার; তাদের গবেষণার কাজ সমর্থন করা, অর্থ সাহায্য করা আবশ্যিক কর্তব্য। তা না হলে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য কোনো সরকারই অর্থ বিনিয়োগে রাজি হতো না। যে বিজ্ঞান-গবেষণার মূল্য কেবল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—তার জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই। যে গবেষণার ফল অর্থার্জনে সহায়তা করবে, যার সামরিক মূল্য রয়েছে—তাকে সবাই মাথায় তুলে নেবে।···এইখানে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী দ্বিধা ও সংঘাতের মুখোমুখি হয়। একদিকে দেশ, তার আত্মরক্ষা,—অন্যদিকে অভীপ্সিত বিজ্ঞান সাধনা আর মানবিকতা।···অনেক বিজ্ঞানীই এখানে হোঁচট খেয়েছেন, তাল সামলাতে পারেন নি। আত্মপ্রসাদ লাভের লোভে মানবিক ধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন। এখানেই তাঁদের মনের দৈন্য ও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, মানসিক স্থৈর্যের অভাব ঘটেছে। অথচ বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে এতটুকু ঘাটতি চোখে পড়ে না।—যেন দ্বিমুখী পৃথক ধারা স্বতন্ত্র তালে ও চালে বয়ে যাচ্ছে!

···সেইজন্যই সম্ভবত হাইসেনবার্গের প্রশ্নের উত্তরে এনরিকো ফের্মি বলতে দ্বিধা করেন নি যে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে জৈবিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলেও এমন একটি সুন্দর পরীক্ষা বন্ধ করা যায় না!···

একদিকে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার জয়যাত্রা ঘোষিত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে শোনা যায় বিজ্ঞান বিরোধী গুঞ্জন। এতে কিছু বিজ্ঞানীও যোগ দিয়েছেন। তবু দোষ-ত্রুটি যাই হোক্ না কেন

বিজ্ঞান লব্ধ আরামের সুযোগ সুবিধা কেউ ছাড়তে চান না। সহজ করে বলা যায়, দোষটা বিজ্ঞানের নয়, দোষ প্রয়োগ বিধিতে ; কিছুটা সেইসব বিজ্ঞানীরও যারা জেনে শুনে মানব-ধর্ম বিরোধী প্রয়োগ-কর্মে লিপ্ত থাকেন। শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরি করতে যে সব বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁদের বেলা একথা খাটে। এঁদের পক্ষে যুক্তি হলো দেশরক্ষার দোহাই ; তাছাড়া নিজস্ব গবেষণা-কাজে অঢেল সুযোগ-সুবিধা। জীবন যাত্রায় বিজ্ঞান স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে, তার স্বীকৃতি দানে মানুষের কুণ্ঠা নেই ; কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাফল্যের দোষও বিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো হয়। বৈষম্য সৃষ্টি— বিজ্ঞান বা তার প্রয়োগ কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে তাহলে দোষটা কার? ব্যবধান সৃষ্টির পথে অবাঞ্ছিত সামাজিক কিংবা মানবিক অসংগতি দেখা দিতে পারে ; অনুরূপ বিজ্ঞানের প্রয়োগ ত্রুটিহীন বলা চলে না। এই রকম অবস্থায় বিজ্ঞানীরা যদি নিশ্চিন্ত মনে তাদের মৌলিক গবেষণায় লিপ্ত থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানীদের এই নিস্পৃহতা ধিক্কার ও নিন্দা পেয়ে থাকে। বিজ্ঞান-চর্চার জন্য অর্থ বরাদ্দের বিরুদ্ধে যে গুঞ্জন শোনা যায়, তার মূল কারণ হলো বিজ্ঞানীদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত অমনোযোগিতা। যত বেশি অমনোযোগিতা, সংকটের গভীরতা তত অধিক। আর এই সংকটের পথে বিজ্ঞানের উপর সাধারণের আস্থা ও নির্ভরতার ভাঙনের শুরু।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন, বিবর্তন গোষ্ঠী মানস সম্বন্ধিত, অর্থাৎ জৈবিক নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে বংশ বিস্তার ও বৈচিত্র্যের ধারা দলগত সংস্কৃতি বা কালচার যুগ যুগ ধরে সমাবিষ্ট করে রাখে। বেঁচে থাকা বা পরিবেশকে জয় করাই মানুষের লক্ষ্য নয়। মহত্তর তৃপ্তি এবং পূর্ণতর উপলব্ধি কাঙ্ক্ষনীয়।…অন্য এক শ্রেণী পণ্ডিতের মতে মানুষের জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তন পাশাপাশি চলে। কিন্তু

গতি শ্লথ হওয়ার দরুন জৈবিক বিবর্তন অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চাপে তার শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে, এমন কি তার গতির মোড় ঘুরে যেতেও পারে।

প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারা বজায় রাখতে সাধারণভাবে হানিকর জীনগুলো অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে মানুষের প্রজননক্ষম কালমাত্রা বেড়ে যাওয়ার দরুন বিবর্তনের এই ক্ষমতা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে।

বিবর্তন সম্পর্কে আর একটি বিপরীত মতবাদ হলো যে, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অগ্রসরতা মুষ্টিমেয় উন্নত জাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আয়ত্ত করতে থাকবে। এই রক্ষণশীলদের মতে, এমন অনেক দেশ বা জাতি আছে যারা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে উন্নতির সোপান আরোহণের অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য।

পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে চলাই জীবের ধর্ম। নিজের প্রবর্তিত পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষ তাল রাখতে গিয়ে পিছিয়ে পড়লেই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইভাবে একটি সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে ; তবু ধরে নেওয়া হয়, সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি ছাড়া সমাজ কোন নতুনকে গ্রহণ করতে পারে না। আবার দ্বিধাহীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় না যে, প্রযুক্তিবিদ মানুষ একটি উপযুক্ত সাংস্কৃতিক ধারা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া সংস্কৃতি তো আর্থনীতিক কিম্বা রাজনৈতিক মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না। উন্নতিশীল দেশগুলিতে যদিও বা একটা সুনির্দিষ্ট কাঠামো লক্ষ্য করা যায়, উন্নতিকামী দেশগুলিতে সেখানে এখনও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

বিজ্ঞান ও তার প্রায়োগিক বিদ্যা মানুষের আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি মানুষের সমাজের উপর, সামাজিক সমষ্টিগত আচরণের উপর—বিশেষ করে মূল্যবোধের উপরেও সুদূরপ্রসারী প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। জীব বিজ্ঞানের

অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কারকে অদূর ভবিষ্যতে প্রায়োগিক পর্যায়ে মানুষ নিঃসন্দেহে দেখতে পারে। সামাজিক আচরণের এবং মূল্যবোধের উপর তাদের প্রভাব মানুষ যদি এড়াতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে না। যে কর্ম প্রচেষ্টা মানবত্বের মর্যাদা হানি করে তা গ্রহণীয় নয়; তা অবশ্যই পরিতজ্য। মূল্যবোধের এই মাপকাঠি সাধারণভাবে সকলের কাছেই প্রযোজ্য।

যে বিজ্ঞানী মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর ভাবনা চিন্তা করে সে চায় কতগুলি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ যেন সকলের মধ্যে ফিরে আসে; যেমন জ্ঞানস্পৃহা, সততা, করুণা শ্রমশীলতা। এই সঙ্গে সে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় বিপরীতধর্মী দোষগুলিকে; যেমন অজ্ঞানতা, অসাধুতা, স্বার্থপরতা এবং অলসতা। মানুষের সকল কাজের মধ্যে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ সচেতন থাকলেই বোঝা যাবে মানবিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ আছে। এর অভাব আছে বলেই বর্তমান যুগকে এত অমানবিক মনে হয়।

আধুনিক বিশ্বে ধর্ম ও বিজ্ঞানের একটা আপাত বিরোধ দেখা দেয়। অথচ স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে বিজ্ঞান হিসাবে অধ্যয়নের কথা বলেছেন। পশ্চিমে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যে সংগ্রাম বার বার প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, তারজন্য বিবেকানন্দ উদার, যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে ধর্ম যদি যুক্তিকে অস্বীকার করে তবে সে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস-দুর্বোধ্যতার প্রতিরোধী হিসেবে তিনি বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রচার চেয়েছিলেন। যুক্তি নির্ভরতা মানুষের চিন্তার অগ্রগতিকে প্রবহমান রাখে—সেটিই বিজ্ঞান।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে বুঝতে, মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করছে। মানুষের বহিরঙ্গরক্ষা, পরিবেশ ও তার প্রভাব নিয়ে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পথে বিজ্ঞান অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ

করেছে। অথচ অন্তর্জগতের ঘটনা—যেমন আত্মসচেতনতা, আত্মজ্ঞান সম্পর্কে মনোবিজ্ঞান এখনো অন্ধকারে। টেলহার্ড দ্য শার্দ তাঁর 'দি ফেনোমেনান অফ ম্যান' (The Phenomenon of man) নিবন্ধে বলেছেন, "নিজের মধ্যের সত্তাটি যখন একান্ত মনোযোগের পথে বিচার করা হয়, তখন মনে হয় মানুষ একটি তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সংকোচনমুখী জীব। তার বহুল প্রচারিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আসলে একটি সামগ্রিক রূপের নগণ্য অংশমাত্র—মূল 'সমগ্রতা' আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। আমাদের ঝোঁক হলো প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা ; আর সেই দেখার কালে আমরা অন্তর্জগতের সীমাহীন দিগন্তের কথা ভুলে যাই।"···অথচ ভারতীয় দর্শনে, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ বিশ্বের বাইরে নয়। মনে পড়ে, দু দশক আগে স্যর জাহাঙ্গীর গান্ধী বলেছিলেন, "সবার আগে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, না হলে আমাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব। বর্তমান কালে, যে দ্রুততায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের হাতে কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি হাতিয়ার যুগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সামাজিক জ্ঞান সেই দ্রুততার সঙ্গে তাল রেখে তাদের কাজে লাগাতে পারছে না। এই পরিস্থিতি শুধু বিজ্ঞানীর কাছে নয়—সামাজিক, রাজনৈতিক সত্তা বিশিষ্ট অখণ্ডিত পরিপূর্ণ মানব-মানসের কাছে এক চ্যালেঞ্জ।"

স্যর জাহাঙ্গীর গান্ধীর বক্তব্যের পর বিশ বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে মানবিক অগ্রগতি-প্রগতির পরিপূর্ণতার ধারণাবোধ আরো সঙ্কীর্ণ, আরো যেন সঙ্কুচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আর মানবিকবোধের অগ্রগতি—দুটির বৃদ্ধি ঘটেছে, তবু দু'য়ের মধ্যে ফাঁক কমে নি, তারও বৃদ্ধি ঘটেছে। মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো যদি আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাভাবনার অথবা নিয়মিত শিক্ষার বিষয় না হয়, যদি এ জ্ঞান ও শিক্ষার ভাগ নতুনতর ভবিষ্যের মানুষের হাতে তুলে না দেওয়া হয়, তবে এই ফাঁক বন্ধ হবে না, ব্যবধান বেড়ে চলবে। ব্যবহারিক চাহিদা মিটলো—অতএব

আমাদের ভাবনা-চিন্তার আর কিছুই নেই—এই ভেবে আত্মতৃপ্ত হয়ে যদি নির্লিপ্ত থাকা যায়, তাহলে এই সমাজবদ্ধ মানবজাতি নিজের কাছে এক বোঝা হিসেবে দাঁড়াবে।

অন্তর্জগতের ধ্যানধারণা ছাড়া এই বোঝা থেকে ভারমুক্ত হওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। যে সত্য অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভারতীয় দর্শনে তাকেই বলা হয় ধর্ম এবং যে সত্য বহির্জগতের অভিজ্ঞতালব্ধ তাকে বলা হয় ভৌত বিজ্ঞান। ভিতর ও বাহিরের অভিজ্ঞতার যোগেই সমগ্র সত্যটি উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। কারণ নব বিজ্ঞান জানিয়েছে, সত্যের পথে মানুষ শুধু ক্রিয়াকলাপের দর্শক বা অবজার্ভার হবে না, তাকে অংশী বা পার্টিসিপেটার হতে হবে। প্রকৃতির বিশ্বলোকের ক্রিয়াকলাপে অংশী হতে হবে বলেই, অন্তর্জগতের চিন্তা ও বোধের একটি বাহ্যিক অনুমোদনের প্রয়োজন থাকে। নব বিজ্ঞান তাই মানুষকে বিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য রূপে জানার চেষ্টা করে—এই পথেই প্রকৃত সত্য বিজ্ঞানের কাছে উদ্ভাসিত, উদ্‌ঘাটিত হবে।

যে সত্য প্রকৃতিতে বিশ্বলোকে মানুষ খোঁজে, তা মানব-সত্য। বিজ্ঞান মানব-অতিরিক্ত নয়। মানব কল্যাণ-মানবতাবিমুখ বিজ্ঞান মানুষের ধর্ম নয়। এটিই সত্য। এখানেই থাকে পরিবেশ ভাবনা, অন্বেষণের যাত্রাপথে চলার আনন্দ।

শিশুসাহিত্য

খাদ্যে প্রোটিন নিয়ে প্রাথমিক ভাবনা

আদ্যিকাল থেকে মানুষ খাবার নিয়ে ভেবেছে, সংগ্রহে মেতেছে। তবু, এতদিনের এত তথ্য সংগ্রহের পরও দেখা যায় খাদ্য-বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা পায় নি, আর পরিপোষক বা পুষ্টিজ্ঞানে ঘাটতি অনেক। প্রাণপ্রবাহ বজায় রাখতে দরকার কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট বা তেল, প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড, ভিটামিন আর নানা ধাতব লবণ। এদের মধ্যে প্রোটিন যেন মধ্যমণি। আর প্রোটিন কথার মানেই তো প্রথম। চামড়া-রবারের মত প্রোটিনকেও স্বাভাবিক জৈব পদার্থ বলা যায়—এরা অতিকায় অণু। এই বৃহদাণুর দল ক্ষুদ্রাণু থেকে গুণ ধর্মে আলাদা, এদের কেমিস্ট্রিও ভিন্ন।

রসায়ন শাস্ত্রে জানানো হলো, প্রোটিনের উপকরণ হলো ছোট-খাটো আকারের এমিনো এসিড। শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে এমিনো এসিড এক জাতের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গড়ে তোলে প্রোটিন। শৃঙ্খলের আংটা হলো পেপটাইড বাঁধন। আর এই অণুরা ওজনে কী যে ভারী—দশ হাজার থেকে কয়েক কোটি পর্যন্ত এই ভার। বিশ থেকে পঁচিশটি এমিনো এসিড আবিষ্কার হয়েছে। এদের দশটি জীব জগতে বিশেষ দরকারী, এরা আসে বাইরে থেকে। আর বাকি কটিকে জীব-শরীর নিজেই তৈরি করে নিতে পারে। নানাভাবে নানা গুচ্ছে, দলে, ঐ বিশ-পঁচিশ এমিনো এসিড সেজে দাঁড়িয়ে নানা প্রোটিন গড়ে তোলে। শরীরের গঠনে, নানা অনুঘটক বিক্রিয়া কালে, নিয়ন্ত্রণ বা প্রহরায়—যে দিকেই তাকানো যাক, কোন না কোন প্রোটিন আছে। আর সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো প্রকৃতির ঝাড়াই বাছাইয়ের পদ্ধতিতে আলোর সাপেক্ষে বামাবর্ত্তী পলিমারদের একটা আলাদা

মর্যাদা আছে। এদের দিকেই প্রকৃতির স্বাভাবিক টান। ···প্রাণ প্রবাহে ডি-এন-এ—আর-এন-এর নিরবচ্ছিন্ন কার্যধারায় প্রোটিন সৃষ্টি হচ্ছে, আর নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য এনজাইমের ক্রিয়ায় ভেঙেও যাচ্ছে।···

দু'ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায়—ফাইব্রাস অথবা তান্তব-অংশুল আর গ্লোবুলার বা বটিকাকার। ফাইব্রাস প্রোটিন হলো শক্ত, সহজে ভাঙে না; আর তাই শরীরে এই প্রোটিন যত শক্তির কাজটাই করে থাকে। চুলে, পেশিতে, টেণ্ডনে এ জাতীয় প্রোটিন থাকে। আর রেশম বা সিল্ক—এরাও তন্তু প্রোটিন। এরা জলে গলে না।

অন্যদিকে তুলনা বিচারে গ্লোবুলার প্রোটিন জল, এসিড, বেস বা লবণ সলুসনে গলতে পারে, পাওয়া যায় আঠালো কলয়ড জাতীয় দ্রবণ। এনজাইম, হর্মোন, হিমোগ্লোবিন, এলবুমিন ইত্যাদি হলো বটিকা-প্রোটিন। মূলে সব প্রোটিনের ভিতে মিল; তবু বাড়িতে বাড়িতে মহলে মহলে যেমন গঠনের রীতিতে তফাত, সেই প্রভেদ নানা প্রোটিনের আকারে, প্রকারে, গুণে, ধর্মে।

প্রোটিন কোথায় পাওয়া যাবে খুঁজতে গেলে দেখা যাবে এরা আছে প্রাণজগতে—উদ্ভিদে অথবা প্রাণীদেহে। এনিমেল বা প্রাণী প্রোটিন কিন্তু উদ্ভিদ প্রোটিন থেকে এমিনো এসিডের হাজিরাতে ধনী। সেইদিকে উদ্ভিদ প্রোটিনে কিছু এমিনো এসিডের ঘাটতি আছে। তবে এক জাতের উদ্ভিদে যে ঘাটতি, অন্য জাতে তার দেখা যায়; অন্য খামতি সেখানে। এদিক ওদিক মিলিয়ে জুলিয়ে উদ্ভিদ প্রোটিনের এই দোষটা কাটানো যায়। ডালমাখা ভাতে সব এমিনো এসিড প্রায় পাওয়া যায়। এক কথায় ডাল জাতীয় শস্য আর ধান গম জাতীয় সিরিয়েল শস্য দুয়ে মিলে পুরো এমিনো এসিড পাওয়া সম্ভব। কাজেই মাংস নইলে পুষ্টি নেই, এমন কথা সঠিক নয়। পশুরা তাদের শরীরের প্রোটিন তৈরি করতে গাছ থেকেই তো এমিনো এসিডের যোগান নেয়।

তবে উদ্ভিদ প্রোটিন থেকে প্রাণী প্রোটিনে রূপান্তরটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। আর যতই হাঁকডাক তোলা হোক না কেন, ঐ খরচের বহরের জন্য আজো পৃথিবীর শতকরা সত্তর ভাগ প্রোটিন উদ্ভিদই যুগিয়ে আসছে।

প্রাণী প্রোটিন বলতে আমরা বুঝি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ—এইসব। তবে প্রোটিন খুঁজতে মানুষ এখন অন্যত্রও হাত বাড়িয়েছে। ব্যাঙের ছাতা, প্ল্যাঙ্কটন, ইস্ট ইত্যাদি এখন মানুষ আর তার পোষা পশু পাখির খাদ্য তালিকায় এসে গেছে।

উদ্ভিদ প্রোটিন যখন দামে সস্তা, সহজ লভ্য—সেটা নিয়েই মানুষের ভাবনা বেশী। সিরিয়েল শস্যদানায় প্রোটিনের ভাগ কম—শতকরা ৬ থেকে ১৪ ভাগ মাত্র। অন্যদিকে তৈল বীজ হলো প্রোটিনে সমৃদ্ধ। তাই তৈল বীজের চাষ নিয়ে আজ এত মাতামাতি। উদ্ভিদ প্রোটিন থেকে প্রাণী প্রোটিনের রূপান্তরে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ প্রোটিন নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সোজাসুজি উদ্ভিদ প্রোটিনে আমরা, ভারতীয়রা আগে থেকে ভেবেচিন্তে যেন হাত দিয়েছি। তৈলবীজ প্রোটিনে সমৃদ্ধ; তবে গুরুপাক। তবু প্রোটিন যোগানদার হিসেবে এরা কিন্তু আজ আশা ভরসা।

এছাড়া গাছের পাতা বা অন্য অংশ, যা গরু-ছাগলের মত মানুষ খেতে পারে না, টেকনোলজির প্রয়োগে সেখান থেকে প্রোটিন উদ্ধার করার কাজে মানুষ এখন দেশেবিদেশে লেগে পড়েছে। মহিশুরের কেন্দ্রীয় ফুড টেকনোলজি গবেষণা কেন্দ্রটি, শোনা যায়, পাতা থেকে ডাল জাতের প্রোটিন উদ্ধার করতে সমর্থও হয়েছে। শুধু পাতা নয়, শ্যাওলাও এজাতীয় প্রোটিন যোগাতে পিছিয়ে নেই। ছাগলের মত মানুষও যেন সর্বভুক হয়ে যাচ্ছে—যা সোজাসুজি খেতে পারে না, তাকে টেকনোনজির ময়ান দিয়ে নরম করে নিচ্ছে, আর খেতে চাইছে!

উদ্ভিদ প্রোটিনে অনেক গুণ, তবে এ যে একেবারে নির্দোষ তা বলা যায় না। এরাও দোষে গুণে ভরা। পাতা, ডাল বা বীজ থেকে যে

প্রোটিন পাওয়া যায় তারা কেউ কেউ বিষাক্ত, টক্সিক। এই টক্সিক বস্তুটা যে কী, আর কী করে এসব দূর করে নির্দোষ প্রোটিন খাদ্য পাওয়া যায়, এই হলো আজকের বিজ্ঞানীদের সমস্যা। অবশ্য অনেক বিষাক্ত প্রোটিন রান্নার সময় ভদ্র সভ্য হয়ে যায়; খেসারি ডালের বিষ বার বার ধুলে চলে যায়। তাছাড়া শরীরও কোন কোন টক্সিক প্রোটিনকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। নানা পদ্ধতি ভাবা হয়েছে—ভাবা হচ্ছে। তবে শরীরের লেবরেটারিতে সব উদ্ভিদ প্রোটিন সহনীয় নয়। এখানে কাজ করে অভিজ্ঞতা। আর কেন সহনীয় নয়—তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেমিস্ট্রি বা বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। এইখানেই তো থাকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপার!

ভারতীয়রা যে খাবার খায় তার মধ্যে প্রোটিন গড়-পড়তায় থাকে ৫৫ গ্রাম, যার মধ্যে প্রাণী প্রোটিন হলো মাত্র ৬ গ্রাম। তবে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা নেয় ৪৮ গ্রাম প্রোটিন যার মধ্যে ৭ ভাগ হলো প্রাণী প্রোটিন—যার বেশীর ভাগ মাছ। হায়দ্রাবাদের জাতীয় পুষ্টি বিভাগ অবশ্য বলে—কমপক্ষে ভারতীয়দের খাওয়া উচিত ৫৭ থেকে ৫৮ গ্রাম প্রোটিন! তবে তারা যে খাদ্য তালিকা দিয়েছে সেখানে মাছ মাংস ডিম নেই! আর আমরা পশ্চিমবঙ্গে আজকাল কদিন আর ঐসব খেতে পাই!

একটা কিন্তু আশার কথা। ভারতীয়দের প্রোটিন গ্রহণ ক্রমশ বাড়তির দিকে, প্রোটিনের যোগান আর চাহিদার অনুপাতও বাড়ছে! তবে সে সব যোগায় উদ্ভিদ জগৎ। বন সংরক্ষণ, শস্যোৎপাদন ইত্যাদি নিয়ে কাজ আর ভাবনাও অতএব বাড়াতে হয়। নইলে প্রোটিনে পুষ্টিকর খাদ্য কেমন করে জুটবে!